হাসতে হাসতে [illegible]

সুনীল দাস সম্পাদিত



সুনীল দাস সম্পাদিত

হাসতে হাসতে বারোখানা

পুষ্প
তের, বাঙ্গুর এভিন্যু, কলকাতা পঞ্চান্ন

প্রচ্ছদ—বিমল দাস

প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮। প্রকাশক ভারতী দত্ত 'পুষ্প' প্রযত্নে 'ঘোষ লাইব্রেরী' ১৩ বাঙ্গুর এভিন্যু 'বি' ব্লক কলকাতা-৭০০ ০৫৫। মুদ্রক দাশরথি চক্রবর্ত্তী লক্ষী প্রিণ্টার্স ১৮, প্যারী মোহন সুর গার্ডেন লেন কলকাতা ৭০০ ০৮৫।

বারো টাকা

"হাসতে হাসতে বারোখানা" আমার ছোট্ট বন্ধুদের নিজস্ব বই। এই সংকলনে কী ধরনের গল্প আছে তা এই বইয়ের নামের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাব।

বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সব সাহিত্যিক ছোটদের মন জয় করে আছেন, তাঁদের অনেকের লেখাই সংকলনের ছোট্ট পরিসরে রাখার চেষ্টা করেছি। এই সংকলনের সবচেয়ে গর্ব এই যে নতুন সাহিত্যিক বন্ধুদের দিক থেকেও আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকিনি। কয়েকজন নতুন প্রতিভাকেও আমরা ছোটদের আসরে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশে হাজির করতে পেরেছি।

গল্প সংকলন দুরূহ কাজ। বিশেষ করে ছোটদের জন্য গল্প সংকলন। জানিনা এই কাজে কতটা সফল হয়েছি। অবশ্য তার বিচারক আমার ছোট্ট পাঠক বন্ধুরা। এই কথা স্মরণ রেখেই তেরটি বিভিন্ন ধরনের হাসির গল্প এই গ্রন্থে রেখেছি। এই সংকলনের কাজে শ্রী অবন বসু, আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আর আশা করি ছোট্ট বন্ধুরা ছাড়াও সব বয়সের পাঠকেই খুশি করবে এই সংকলন। আর তাহলেই বাড়বে আমার উৎসাহ আর সার্থক হবে আমার শ্রম।

সুনীল দাস

লেক টাউন, কলকাতা।

যে সব গল্প আছে

শিবরাম চক্রবর্তী

বিনির জন্মতিথি

বিতিকিশ্রী এক বাজখাঁই—উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদের সঙ্গে বেড়ালের আর্ত্তনাদ মেশালে যা হয়—শার্সীর ফাঁক দিয়ে ভেসে এল।

শার্সীর ফাঁক? হ্যাঁ কী বদ্‌খেয়ালে মনে নেই, শ্রীমতী বিনির বিগত জন্মদিনে একটা গুল্‌তি ওকে উপহার দিয়েছিলাম। সেদিনই আমার পড়ার ঘরের শার্সীতে এই ফাঁকটার উদ্ভব হয়েছে। তারপর থেকেই পথ-চল্‌তি যা-কিছু আওয়াজ—কী মোটরের, কী ভিখিরির, আর কী ফেরিওলার—সবই ঐ অনর্গলতার ভেতর দিয়ে অবলীলাক্রমে ভেসে আসে!

বিনি? বিনি আমাদের প্রতিবেশী জোয়ারদার মহাশয়ের দুহিতা এবং পাড়ার আমরা সবাই হচ্ছি ওর দুহিত। এক ফোঁটা একটু মেয়ে, কিন্তু এই বয়সেই দোহনের এত কৌশল ওর জানা যে কী বলব!

শার্সীর ফাঁকের মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে তাকাই। সঙ্গে সঙ্গেই জানালা—বা জানালার ধ্বংসাবশেষ, যাই বলো—উন্মুক্ত করে' ফেলতে হয়। উক্ত গুল্‌তি হস্তে শ্রীমতী বিনিই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। তিনিই তারস্বর ছেড়েছেন—

'কাকাবাবু—কাকাবাবু! আমি তোমাকে ডাক্‌ছি—'

বিনির পড়শীরা—আমরা সবাই ওর বেসরকারী কাকা। বিনা বেতনে, এমন

কি অনিচ্ছাসত্ত্বেই, ওর পিতৃব্যপদে অভিষিক্ত!

মুহূর্তের মধ্যে আমি নীচে নেমে পড়ি।

এক অভ্রভেদী বিনি, তার ওপরে ওর হাতে স্বয়ং গুলতি—ওর ভেদাভেদ-জ্ঞান লুপ্ত হ'তে কতক্ষণ? আমার নিজের মধ্যেই ছ্যাঁদা হয়ে যেতে পারে।

এক ছুটে বিনির পাশে গিয়ে দাঁড়াই!

'তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এলুম,' বিনি বলে: 'আমার বার্থ-ডে পার্টিতে এসো। শুক্রবার দিন। তোমাকে আসতেই হবে, তুমিই আমার সবচেয়ে ভালো কাকাবাবু কি না! এসো কিন্তু।

আমি ইতস্ততঃ করি: শুক্রবার? কিন্তু আমি—সেদিন....সেদিন যে আমার—! সেদিন কিন্তু—' কিন্তু-কিন্তু করতে থাকি।

'একেবারে বড়ো বড়ো লোকের পার্টি—তোমার কোনো ভয় নেই কাকাবাবু!' বিনি আমাকে উৎসাহ দ্যায়: 'ছোট্ট ছেলেপিলেরা একদম বাদ—কেউ নেই! কাউকে তাদের ডাকছিই নে—ভারী গোলমেলে তারা। বড্ড চ্যাঁচায়।'

য়্যাঁ? বিনির হ'ল কী? আমি বিনির দিকে বিস্ফারিতনেত্রে তাকাই। আমার ধারণা ছিল, কেবলমাত্র গলার জোরেই ও টিঁকে রয়েছে; এবং আমরা সবাই কানের দুর্বলতার জন্যই শুধু কাহিল হচ্ছি।

'এবার আমি ঠাণ্ডা আর লক্ষ্মী মেয়ে হবো।' কোমলকণ্ঠে বিনি বলে: 'আর চ্যাঁচাব না। গোলমাল করা ভালো নয়! তাহলে তুমি আসছ তো কাকাবাবু? অবিনাশ-কাকাও আসবেন—সুষমা-কাকীও—বুঝলে।'

এটা সুসংবাদ বটে। অবিনাশ-পরিবারের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতাই রয়েছে। সুতরাং নিশ্চয়ই যে যাবো, বিনিকে নিঃসংশয়ে জানিয়ে দিতে কোনো বাধা হয় না।

সন্ধ্যেবেলায় অবিনাশের সঙ্গে দেখা হ'লে কথায় কথায় বিনির জন্মতিথির কথাটা উঠল।

'ও, হ্যাঁ—' বললে অবিনাশ: 'ভারী চমৎকার মেয়ে বিনি। আমরা না গেলে ও খুব দুঃখিত হবে, দুঃখিত করতে ওকে চাই নে, কিন্তু উপায় নেই—' দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ওর সমাধা হয়: 'যাওয়া হয়ে উঠবে না আমাদের।

'কেন বল তো? আমি একটু বিস্ময়ান্বিতই। ও তো বলেছে ও চ্যাঁচাবে না। নতুন জন্মদিনের আশঙ্কায় ওই রকম কি একটা সঙ্কল্পও না কি ও করে বসেছে?'

'না, সেজন্যে না—ভালো করে আশেপাশে তাকিয়ে নিয়ে গলাটা পর্দা দু'য়েক

নামিয়ে আনে অবিনাশ।

*　　　　*　　　　*

'মুখুজ্যে!' ফিস্‌ফিস্ করে বলে ও। চোখ এবং হাত কপালে তুলে বলে।

আমি ঠিক প্রণিধান করতে পারি না।

'একটু আগেই জেনেছি।' অবিনাশ জানায়ঃ 'মুখুজ্যেদেরও বিনি নেমন্তন্ন করেছে। আর মুখুজ্যেরা যেখানে যাচ্ছে—

সে-জায়গা কেন যে ওর গন্তব্যের অন্তর্গত নয় অষ্টাদশপর্বে সুবিস্তৃত, বিরাট এক সামাজিক দুর্ঘটনার বিবৃতি দ্বারা আমার কাছে বিশদ ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করে।

বাড়ী ফিরে বীণাকে বলি।

'সুষমারা যাচ্ছে না?' বীণা বলেঃ 'না যাক আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরাও যাচ্ছি নে, দাদা।'

'কেন? আমাদের আবার কী হ'ল?' আমি বেশ অবাক হই।

'প্রতিমা!' বীণা মুখচোখ বাঁকায়ঃ 'প্রতিমারাও যাচ্ছে যে। বিনি নিজেই আমায় বলেছে।'

আমার দম আটকে আসে। আমিও মাথা নাড়ি। বাস্তবিক, প্রতিমারা যে-পার্টিতে যাচ্ছে সেখানে পা বাড়ানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। প্রতিমার জন্যে ততটা নয় যতটা বলতে গেলে, ওর—কি বলব....প্রতি-বরের জন্যেই বিশেষ করে আরো। ওর বরকে দেখলে এমন এক বর্ব্বরতা আমার মধ্যে চেপে ওঠে যে, ইচ্ছে করে এক চড়ে ওটাকে সোজা করে আনি।

সত্যি বলতে কি, বীনা এবং আমি বেশ একটু উদার-প্রকৃতিরই, কিন্তু তা হ'লেও—তবু—তথাপিও—প্রতিমা আর তার বরকে মুখোমুখি বরদাস্ত করা আমাদের সহনশীলতার প্রতি, বেশ একটু, বেশী একটু অত্যাচারই যেন।

পরদিন সকালে বিনির সঙ্গে ভেট হ'তেই দুঃসংবাদটা আমি আস্তে আস্তে ব্যক্ত করি। বেচারীর বড়ো বড়ো কালো চোখ জলে ভরো ভরো হয়ে ওঠে।

'আমি এত দুঃখিত যে—' স্খলিতকণ্ঠে আমি বলিঃ 'তোমার পার্টিতে যেতে না পারায় এত আমার মন খারাপ কি বলব?' ভগ্ন স্বরে ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিঃ 'যাক, তুমি কিছু মনে করো না, লক্ষ্মী মেয়ে। যেমন আমরা যাচ্ছি নে, তেমনি তার বদলে, তোমাকে ডবল করে জন্মদিনের উপহার পাঠাবো! কেমন?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই, বিনির মুখ থেকে মেঘলা আমেজ কেটে যায়—জল-জলে চোখ আবার জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। এক মুহূর্তেই একখানা হাসিখুসির মলাট একেবারে!

ওর পিতৃব্য-প্রীতির অসারতা দেখে প্রাণে ব্যথা পাই।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা, পোষ্টাপিসে যাবার পথে, মুখুজ্যের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ।

'এই যে চক্রবর্তী। এক পাড়ায় থাকি, অথচ পাত্তাই পাওয়া যায় না! থাকো কোথায়? বিনির পার্টিতে অবিশ্যি দেখা হ'ত তোমার সঙ্গে—বীনাও আসত নিশ্চয়? অনেকদিন ওকে দেখিনি, 'কিন্তু ভাই-মুখুজ্যে ধীরে ধীরে বিস্তারিত হয়ঃ 'কিন্তু বিনির পার্টিতে আমাদের যাওয়া হবে না। খুব খারাপ, বলাই বাহুল্য। আমিই হচ্ছি বিনির সবচেয়ে ভালো কাকা, বিনি নিজেরমুখেই আমাকে বলে গেছে, অথচ আমার যাবার উপায় নেই'—মুখুজ্যে ক্রমশঃ বিদীর্ণ হ'তে থাকেঃ 'কি করে যাবো? ওই অবিনাশ হতভাগাটা—! সেও যাচ্ছে না কি। সপরিবারেই যাচ্ছে। দু'চোখে ওদের আমি দেখতে পারি নে। সত্যি।'

'এক চোখে দেখলেও তো পারো?—মুখুজ্যের কথার ওপর আমি কথা বলিঃ 'টেনে-টুনে কোনো রকমে দেখা যায় না কি?'

'যাক্, কী আর করব—' মুখুজ্যে বলেঃ বিনি যাতে মন খারাপ না করে সেই জন্যে বাড়তি উপহার নিতে হবে আমাদের। গেলাম না, তার ক্ষতিপূরণ। কী করব, বলো? তাছাড়া, শুনলাম—শুনলাম—ঘোষালরাও না কি যাচ্ছে না—'

'কেন, পায়ে হঠাৎ বাত ধরল না কি?' আমি অনুসন্ধিৎসু হই।

'উঁহু, তা নয়। পাছে তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা হয় সেই ভয়েই—' মুখুজ্যে ঘোষণা করে।

আমি দাঁড়িয়ে ভাবি। আমার কেমন খট্‌কা লাগে। সমস্তটাই আমার কেমন-কেমন ঠেকে যেন। দূরে, চায়ের দোকানে, জোয়ারদার মশাই প্রবেশ করছেন আমার চোখে পড়ে। আমি মুখুজ্যেকে ইসারা করি।

পরের মুহূর্তেই আমরা তাঁর টেবিলে গিয়ে বসি; চায়ের হুকুম দেওয়া হয়; কথায়-কথায় কথা ওঠেঃ

'তাহলে বিনির জন্মদিনে এবার একটা জমকালো পার্টি দিচ্ছেন বুঝি?' আমিই উল্লেখ করি।

'পার্টি?—জোয়ারদার মশাই চায়ের শেষ চুমুকটি উদরে প্রেরণ করে, আকাশে

ভুরু তোলেন ঃ 'না তো ! পার্টি কিসের ? অতো টাকা পাব কোথায় ? সেদিন বিনির মাকে এই সোনা-মাগ্যির বাজারে নতুন ডিজাইনের একটা নেক্‌লেস্‌ গড়িয়ে দিতেই ফতুর হয়ে গেছি ভায়া ! কুকুরের বগ্‌লস্‌টা পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে। আবার পার্টি ।—

'এই সব আজগুবি খবর রটে যে কি করে'—'এই বলে, ক্ষিপ্রপদে, বিক্ষিপ্ত-মনে জোয়ারদার মশাই তৎক্ষণাৎ দোকান পরিত্যাগ করেন। উদরনীতিক লোকদের ভয়াবহ পাল্লা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চান বোধ হয় ।

'—কে যে এ সব রটায় ! কারা রটায় এই সব ! ছি ছি !—বলতে বলতে, নিজের জোয়ারের তোড়ে নিজেই তিনি ভেসে চলে' যান।

এবং তাঁর অন্তর্ধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, অবিনাশ আর ঘোষাল এসে হাজির হয়।

অবিনাশ, শ্রীমান মুখুজ্যের দর্শন-মাত্রই বদন বিকৃত করে ; আর আমি, ঘোষালের দিকে বিরক্তি-কুটিল ভ্রূকুটি প্রয়োগ করি, যেমন সচরাচর করে' থাকি ওকে দেখলেই। যথার্থই ওই বর্বরটাকে প্রতিমার বর বলে' ভাবতেই আমি পারি নে।

বর্বরটাও ভ্রূভঙ্গি করে—আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখাতে ওর কার্পণ্য নেই এবং মুখুজ্যেও অবিনাশকে কিছু কসুর করে না।

কথা না বললেও কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলি না।

কিন্তু যাই বলো, ছোট্ট একটুখানি জায়গার মধ্যে কতক্ষণ আর ওই সব করে' পেরে ওঠা যায় ? মুখ-চোখ-ভুরু ব্যথা করা কেবল ! আর সত্যি বলতে, চায়ের আড্ডা জায়গাটাই খারাপ। সেখানে পাশাপাশি বাস' বেশীক্ষণ রাগ-দ্বেষ পোষণ করাই শক্ত। জোরালো হতে না হতেই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে পড়ে—খুব সুকঠিন হৃদয়ও, চায়ের পাকচক্রে, বিগলিত হয়ে আসে—তারপর বিগলিত অবস্থায় আপনা থেকেই জমে গিয়ে গদ্‌গদ্‌ হয়ে উঠ্‌তে কতক্ষণ।

আমাদের মধ্যেও ভাব জমে উঠতে দেরী হয় না।

'বেশ এখন বোঝা যাচ্ছে,' মুখুজ্যে বলে ঃ 'যাদের ভেতরে বেজায় আড়াআড়ি বিনি ইচ্ছে করে' বেছে বেছে তাদেরই কেবল নেমতন্ন করেছে। ভালোই জানে যে কেউ তারা আসবে না শেষটায়। পার্টিটার্টি সব ভুয়ো, কিচ্ছু নেই, শুধু বেশী উপহার আদায়ের ফন্দি। উঃ মেয়েটা কী পলিটিশিয়ান, বাপস্‌ ।'

'মেয়ে-চাণক্য একখানা'। আমি বলে' ফেলি ! 'বড়ো হ'লে ও সরোজিনী নাইডু হবে।

'আশ্চর্য্য, এইটুকু একটা মেয়ের মধ্যে এতখানি ব্যবসা-বুদ্ধি ! ভাবতে মনে ভারী আঘাত লাগে। অবিশ্যি উপহার আমরা দেব, দেবই, কিন্তু এমন কিছু

দিতে হবে যাতে ওর আত্মার উন্নতি হয়। তা' ওর পছন্দ হোক ছাই নাই হোক।' ঘোষাল বলে।

কালই বেস্পতিবার—অতএব, আর কালবিলম্ব না করে' এক জোট হয়ে আমারা বাজারের দিকে বেড়িয়ে পড়ি। আত্মার উন্নতি এবং সুকুমারমতি বালিকার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে, দূরদৃষ্টি-সহকারে উপহার দ্রব্য সব কেনা হয়। মুখুজ্যে কেনেন একটা বুননের বাক্স আর একখানা হিতোপদেশ ; ঘোষাল একজোড়া চীনে মাটির পুতুল আর একটা গোলাকধাম ; অবিনাশ একটা বইয়ের বাসকেট—কালক্রমে কখনো যদি বিনি স্কুলে ভর্ত্তি হবার সুযোগ পায় তখন ওর সৎ কাজে লাগবে—আর, সেই সঙ্গে একখানা আদর্শ নীতিগল্পগুচ্ছ—একেবারে চতুর্থ সংস্করণ।

আর আমি? মণ্টুর মাষ্টার? ফুটবলের দৌড়? বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত-প্রাপ্তি? পঞ্চাননের অশ্বমেধ? উঁহু' নিজের বইটই একেবারেই নয়, এমন কি, প্রেমেনের বইও না—

একখানা কঠোপনিষৎ কেবল!

আত্মার চরম উন্নতি যদি হয় তো ওতেই হবে।

পরশু শুক্রবার দিন যথাসময়ে লোক-মারফতে জোয়ারদার মশায়ের গৃহে এগুলি রপ্তানি করবার সুব্যবস্থা করে' তবে আমরা চায়ের দোকানে ফিরতে পারি।

উপহারের তালিকার আলোচনা করে' আমরা আনন্দে উল্লাসিত হচ্ছি—চায়ের পাত্ররাও উচ্ছ্বসিত—এমন সময়ে জোয়ারদার মশাই প্রবেশ করেন আবার।

'এই যে! ভালো, তোমরা সকলেই রয়েছ—' অমায়িকভাবে তিনি বলতে সুরু করেন ঃ 'বাড়ী ফিরে গিন্নীর সঙ্গে কথা কইলাম। বাস্তবিক, বিনির জন্ম-দিনটা অমনি অমনি যেতে দেওয়া ভালো দেখায় না। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মেয়ে! ভোজটোজ গোছের—পার্টি-টার্টি যাই বলো একটা কিছু হওয়া উচিত! পাড়ার ছেলেমেয়েদের সব নেমন্তন্ন করেছি—সকাল বেলায় তারা আসবে ; তোমরা সন্ধ্যের দিকে এসো—কেমন?'

বলা বাহুল্য, তুমুল উৎসাহেই আমরা নেমন্তন্ন গ্রহণ করলাম।

উপহার-তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে, এই ভোজের ব্যাপারটা বিনির কেমন লাগবে তার প্যাঁচালো পলিটিক্যাল মনে কিরকম কাজ করবে, এইটাই আমরা ভাবছিলাম। জিঘাংসার পরিতৃপ্তির সঙ্গে বেশ একটু মজার আমেজ লাগছিল যেন আমাদের।

কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যের দিকে, স-পরিবারে আমার তিনবন্ধু এবং বিবি-

সমভিব্যাহারে স্বয়ং আমি যখন জোয়ারদার মশায়ের বাড়ী গিয়ে চড়াও হলাম, তখন উৎসব-আমোদের টুঁ শব্দটিও ভেতরের থেকে আমাদের কানে পৌঁছল না।

চারধার চুপ্‌চাপ—নিঃসাড়, নিঃঝুম একদম। য়্যাঁ? ভোজের ব্যাপারটা ভোজবাজির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো না কি?

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। বিজ্ঞাপনের চিন্তিত মা'র প্রতিচ্ছবির মত জোয়ারদার-গিন্নী খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকেই নিঃশব্দে যেন বেরিয়ে এলেন।

'ভেতরে এসো।' ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন: 'হায়, বেচারী বিনি!....ওর বরাত!'

'কেন, কী হ'ল বিনির? আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠি। যা ডান্‌পিটে মেয়ে!—কিছু না হওয়াই ওর আশ্চর্য্য!

'হাম হয়েছে। তবু এসো তোমরা! বড়দের তো হাম হয় না; ছোঁয়াচ লাগার ভয় নেই তোমাদের। তাছাড়া, বিনি তোমাদের সব্বাইকেই দেখ্‌তে চেয়েছে। তোমরা যে-সব উপহার পাঠিয়েছ, দেখে ও ভারী খুসী—ওর যা আনন্দ!—'

বিবেক আমাদের দংশন করতে থাকে, বিছের মত বিছুটি লাগায়। আমরা বিনির মার অনুসরণ করি! বিনির শোবার ঘরে ঢুকি। ছোট্ট বিনি, বালিশের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসেছে, সারা মুখে লাল লাল গুটির দাগ! বিছানার চারপাশে আমাদের উপহারগুলো সুবিস্তৃত করে বিছানো।

বিনি দু'একটা কথা বলে কোনো-রকমে। আমরা সকলেই ওর ভালো কাকাবাবু সকলেই সমান উপাদেয়, আর উপহারগুলোও ওর খুব ভালো লেগেছে, যদিও ও যা আশা করেছিল এগুলো তার ঠিক কাছাকাছি যায় না, তবু ভালো হয়ে উঠে বইগুলো সে পড়বে। বিশেষ করে' হিতোপদেশটা তো বটেই। আর ঐ 'সমসকৃত' বইটাকেও একবার চেষ্টা করে' দেখবে। ভালো হয়ে এবার সে খুব ভালো মেয়ে হবে কি না।

এই বলে' সে ভীতনেত্রে বুননের বাক্স আর বইগুলোর দিকে একবার তাকায়।

আমরা কিন্তু তাকাতে পারি না। হিতোপদেশই কি, আর কঠোপনিষদ্‌ই কি, সব্বাই যেন আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ভেংচি কাটতে থাকে। কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকে সবাই! বিবেকের দংশন আরো মর্ম্মন্তুদ হয়!

অগত্যা, এক্ষেত্রে যা করবার, তাই আমরা করি। পকেটের মধ্যে হাত পুরে দিই; গিন্নীরাও নিজেদের লেডিজ্‌ ব্যাগ্‌ হাতড়ান—পাঁচ টাকা, দশ টাকা যার যা ছিল ঝেড়েঝুড়ে দিয়ে ফেলি।

বীনা তো তার কড়ে আঙুলের আংটিটাই দিয়ে বসে! কোনোআঙুলে না লাগায় বিনির বুড়ো আঙুলেই ওটা পরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বিনাবাক্যব্যায়ে আমরা বিদায় নিই।

বিনি হাসিমুখে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট দ্যাখে। দ্যাখে কি দ্যাখায় সেই জানে!

পরদিন সকালে চায়ের দোকানে জোয়ারদারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আমার প্রশ্নাঘাত ঃ বিনি? বিনি কেমন? কেমন আছে বিনি?

ও, চমৎকার! বড় রাস্তায় ছুটোছুটি করছে বোধ হয়। কিংবা তোমাদের টাকায় ট্রাইসাইকেল কিনবে বলছিলে, কারো সঙ্গে তাই কিনতে গেছে হয়তো।'

য়্যাঁ?...অসম্ভব!'

'না—না।' জোয়ারদার মশাই জবাব দ্যান ঃ 'অসম্ভব না। হামই নয় আসলে। আমার গিন্নী ওর জন্যে একটা রঙের বাক্স এনে রেখেছিলেন—জন্মদিনে উপহার দেবেন বলে'ই এনেছিলেন। তাই দিয়েই, বুঝলে কি না, ও এই হাম বানিয়ে বসেছে! তোমরা কাল চলে যাবার পর ডাক্তার এলেন, কেবল সাবান আর জলের সাহায্যেই তিনি ব্যারাম সারাতে পারলেন! কী সাংঘাতিক দুষ্টু মেয়ে, ভাবো দেখি! পাড়ার ছেলেপিলেদের নেমন্তন্ন করে'ও হামের ছোঁয়াচের ভয়ে সরিয়ে দিতে হলো, ভোজটোজ বাদ গেল সব, ভাবো দিখি একবার কাণ্ডখানা!'

আমি কী একটা জবাব দিতে গেলাম কিন্তু বিনির ট্রাইসাইকেল সমুচ্চ ঘণ্টা-ধ্বনিতে কথাটা তলিয়ে গেল।

এবং কেবল ট্রাইসাইকেল নয়, ঐ সঙ্গে বিনি কিনেছে দেখলাম একটা কান ফাটানো বিউগিল, একটা এয়ারগান (বোধহয় গুলতির প্রমোশনে), একটা টিনের বাঁশী—এবং একজোড়া খরতাল।

এই গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গেই—তার সবগুলোই আমি শুনতে পাচ্ছি এখন।

লীলা মজুমদার

দুঁদে দামুর জীবনখাতা

বটুর ছোটকাকা সর্বদা বলেন তাঁর বড়দার বন্ধু দামুজ্যাঠামশাই নাকি দুর্ধর্ষ পুলিশি গোয়েন্দা। তাঁর দাপটে তেত্রিশ বছর ধরে বর্ধমান আর কেষ্টনগর এলাকায় বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে। বাড়ির কাছে এরকম একটা অসমসাহসিক পুরুষ বাস করাও নাকি মোটা জীবন-বিমার সমান। শুনে বটুর ছোট ভাই লাটু অবাক! জীবন-বিমা করলে তো টাকা পায়। বটু বলল, "অতই যদি সাহস হবে তো জ্যাঠামশাইদের তাসের আড্ডা ভাঙলে উনি আমাকে কেন বলেন, টর্চ নিয়ে আমাকে একটু গলিটা পার করিয়ে দে তো বাবা। সাহসী না আরো কিছু!"

ছোটকাকার মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল। "যাকে-তাকে পুলিশের বিশিষ্ট সুবর্ণ-পদক দেওয়া হয় না, বুঝলে!"

বটু বলল, "তা দেওয়া হবে না কেন? তুমিই তো বলো ফি বছর সাহিত্যের পুরস্কারগুলো যাকে-তাকে দেওয়া হয়। বলোনি, তোমার কবিতার বইটা নাকি না-পড়েই ডাস্টবিনে ফেলে দেয়?"

খুব চটে গেলেন ছোটকাকা। ফরসা মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন; ঠিক তখুনি বড়জ্যাঠাদের তাসের আড্ডায় কে যেন

ফটাস্ করে এক হাত তাস টেবেলের ওপর ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, "মার দিয়া কেল্লা ! বাকি সব দান আমার !" থমথমে চুপচাপ। তারপর শোরগোল ! তারপর সভাভঙ্গ হল। একগাল হাসতে-হাসতে দামুজ্যাঠা বেরিয়ে এসেই বললেন, "কোথায় গেলি বটু ? আমাকে একটু গলিটা পার করে দে তো বাপ।"

বটু বলল, "আমার বুড়ো-আঙুলে ব্যথা। আমি পারব না। ছোটকাকা যাক।" ছোটকাকা ততক্ষণে হাওয়া।

লাটু বলল, "পাঁচ মিনিটের তো হাঁটা। চলে যান না। আমি গেটের বাইরে দাঁড়াচ্ছি।"

দামুজ্যাঠা ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "নিদেন ঐ তেঁতুলতলাটা পার করে দে, বাপ। আর বাড়ি পেঁাছে দিলে তোদের রাবড়ি আর সরভাজা খাওয়াব, আর এমন একটা গল্প বলব যে চুলদাড়ি খাড়া হয়ে উঠবে।"

বটু লাফিয়ে উঠল, ঠিক তো ? ওরে লাটু, শিগগির আয়, দামুজ্যাঠা গল্প বলবেন।" সঙ্গে সঙ্গে লাটুও খাড়া। তখন সবে আটটা, রাতের খাওয়া ন'টায়।

অদ্ভুত এক গল্প ফাঁদলেন দামুজ্যাঠা। দুজনার হাতে দু'গেলাস ঘোলের শরবত ধরিয়ে দিয়ে যে-ঘটনার কথা বললেন, তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু যাঁর গলায় দু'রকম রঙের দুটো সুতোয় বাঁধা দু'রঙের দুটো মাদুলি আর ডান হাতের কনুইয়ের ওপরে রুপোর চেন দিয়ে ঝোলানো কী-সব বিচিটিচির মতো দেখতে জিনিস, তিনি যে সহজে মিথ্যে কথা বলবার সাহস পাবেন না, এ বিষয়ে ওদের মনে কোনো সন্দেহ রইল না। অবিশ্যি তখনও পর্যন্ত রাবড়ি আর সরভাজার দেখা নেই !

দামুজ্যাঠা গোড়ায় বললেন, "কাছাকাছি এসে বোস্। যদি নার্ভাস লাগে, বিষম খেতে পারিস।" সঙ্গে সঙ্গে লাটুর মুখের শরবত ভুল-নল দিয়ে নেমে একাকার কাণ্ড বাধাল। যাই হোক, ও পিঠ চাপড়েটাপড়ে চাঙ্গা করে, দামুজ্যাঠা শুরু করলেন.... ।

"গোড়াতেই বলে রাখি, এটা কিন্তু আমার বানানো গল্প নয়। বরং বলতে পারিস আমার জীবনখাতার দেড়টা পাতা। মাত্র দেড় পাতা ! তার চেয়ে কত লম্বা লম্বা পার্ট মুখস্থ করে পুজোর সময় নাটক করে বাহবা পেয়েছি ! কিন্তু এ-গল্প মনে করতে গিয়ে কপাল ঘামছে ! জানিস বোধহয়, অসামাজিক সমাজে আমার নাম দুঁদে দামোদর ! ও-নাম শুনলে, এদিকে এহেন গুণ্ডা বা মাস্তান নেই যে শিউরে উঠে, জিব কেটে, কানের লতিতে চুন না লাগায়।

লাটু আশ্চর্য হয়ে বলল, "কেন, চুন লাগায় কেন ?"

বটু বিরক্ত হল, "আঃ, তুই বড় বোকা। কানের লতিতে চুন লাগালে পান খেয়ে মুখপোড়াদের জ্বলুনি সেরে যায়!

বটু বলল, "অ। আচ্ছা, বলুন জ্যাঠামশাই, তারপর কী হল?

দুঁদে দামু বললেন, "অত হাল্কাভাবে ব্যাপারটাকে নিচ্ছিস দেখে অবাক হচ্ছি। এদিকে তো ভিতুর একশেষ! গল্প আরম্ভ হবার আগে থেকেই বিষম খাচ্ছিস। তা শোন্। সারাবছরের মধ্যে বর্ষাকালটা সবচেয়ে খারাপ তা জানিস তো?"

লাটু বলল, "মোটেই না। ভূগোল-স্যার বলেছেন বর্ষা না হলে ধান হয় না, কাঁঠালের গায়ে জল না পড়লে কাঁঠালও মিষ্টি হয় না।..."

দামুজ্যাঠা রেগে গেলেন, "না শুনতে চাস্ তো বললেই হয়।

বটু ব্যস্ত হয়ে উঠল, "না, না, জ্যাঠামশাই, আমরা শুনতে চাই।

"তা হলে আর ব্যাঘাত দিসনে। আমি অন্য অর্থে বলেছি বর্ষাকাল সবচেয়ে খারাপ। এখানে খারাপ মানে ভয়াবহ। জল পেয়ে প্রকৃতির বিকট দিকটা চাগিয়ে ওঠে। মানুষের কষ্টের শেষ থাকে না। বন্যা, ধস, ভাঙন, পথেঘাটে জল দাঁড়িয়ে যাতায়াতের অসুবিধা, ডাকাডাকি করলেও কেউ শুনতে পায় না। পাড়াগাঁয়ে আর ছোট শহরে একেকটা বাড়ি যেন একেকটা দ্বীপ হয়ে যায় তার চারদিকে উদ্দাম জলরাশি। ঢোকাও যেমন কষ্টকর, বেরুনোও তেমনি। এই সময় ঐসব অঞ্চলে বেআইনি তৎপরতাও তাই বেজায় বেড়ে যায়। কেউ সাহায্য করতে আসবে না, আসতে পারবে না জেনে দুষ্কৃতকারীরা নির্ভয়ে তাদের দুষ্কর্ম করে যায়। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ হন্যে হয়ে আমার শরণাপন্ন হলেন। 'একটা যা হয় কিছু করো, দুঁদে, নইলে শেষ পর্যন্ত সরকার হয়তো স্রেফ অকেজো বাজে-খরচ বলে গোটা পুলিশ বিভাগকেই তুলে দেবেন। তখন তোমার চেয়ে আমাদের আরও বেশি ক্ষতি হবে!' এই অবধি শুনে আমার মনে ভারী একটা আত্মপ্রত্যয় জাগল। এঁরা তাহলে স্বীকার করছেন যে, পুলিশ বিভাগে আমার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। তার পরে আরেকটু খুলে বললেন, 'আমাদের ক্ষতি বেশি, কারণ আমরা বেশী মাইনে পাই। কিন্তু কাজের বেলা তোমার কাছে আমাদের ভূমিকা তুচ্ছ। এ-যাত্রাটা বাঁচিয়ে দাও। তার জন্য তোমাকে কখনও অনুতাপ করতে হবে না।'

"আমিও মওকা বুঝে বললাম, 'দেখুন, আমার আর আট বছরের সার্ভিস বাকি আছে। এই গোটা সময়টা আমাকে যদি কেষ্টনগরে পোস্টিং দেন, তাহলে একেবারে শেকড় থেকে পাপ উপড়ে ফেলার একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করতে

পারি। তবে, স্যার, এই গন্ধমাদন তো চট করে তোলা যায় না। কিন্তু যতদূর বুঝছি এর কেন্দ্রবিন্দু হল গিয়ে ঐ কেষ্টনগর অঞ্চলটা। আমার বাপের ভিটে। ওখানকার বজ্জাতি আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি।

"মোটকথা, সেই ইস্তক এখানে আছি। এবং বেশ সম্মানের সঙ্গেই কাজ করেছি। আমার পুরনো খেলার সাথীদের একদল দিল্লিতে কি বোম্বাইতে, একজন কুয়েতে পর্যন্ত। কিম্বা শ্বশুরবাড়ি, কিম্বা সংসার ত্যাগী হয়ে চলে গেছে। বাকিদের দিয়ে আমি আমার নিজের একটা ছোট দল করেছি। তারাও নিয়মিত রোজগার পেয়ে বেঁচে গেছে, আমিও দরকারের সময়ে নাড়ি-নক্ষত্র জেনে আসার বন্ধু পাই। জানিস তো, এর ফলে সোনার পদকও পেয়ে গেছি। এদিককার অসামাজিক কার্যকলাপ অর্ধেকের বেশি কমে গেছে। আসছে বছর অবসর নেব। শুনছি, মহা ঘটা করে ফেয়ারওয়েল দেবে। পাখি-দেখার বাইনোকুলার উপহার দেবে। তোদেরও দেখতে দেব।

"এত সবের বদলে ঐ একটাই ক্ষতি হয়েছে। সূর্য ডোবার পর কোনো গাছতলা দিয়ে যাতায়াত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তা তোরা যখন আছিস, তখন একা যাবার দরকারটাই বা কী, তাই বল। —ওগো, কোথায় গেলে? বটু-লাটুর রাবড়ি আর সরভাজা দিয়ে গেলে না?',

ভিতর থেকে জ্যাঠাইমার রাগত গলা শোনা গেল, "কোত্থেকে দেব? তাস খেলতে যাবার আগে নিজেই তো সব সাবাড় করে গেলে!"

দামুজ্যাঠা ভারী লজ্জা পেলেন। "তাই তো। আমি ভাবছি বুঝি কিছু আছে। যাক গে, তার বদলে গল্পের সবচেয়ে লোমহর্ষণ জায়গাটা বলি শোন।

"খুব সহজে এ-জায়গাটাকে এতখানি পাপমুক্ত করা যায়নি। কপালের দুটো চক্ষু ছাড়াও কুড়িটা আঙুলের আগায় কুড়িটা চোখ নিয়ে চলাফেরা করতাম। তা ক্রমে বুঝলাম এখানে দুষ্কৃতকারী আর ভাল মানুষ আলাদা করা শক্ত, কারণ দুষ্কৃতকারীরাও ভালমানুষ সেজে হেথা-হোথা চাকরিবাকরি, দোকান-ব্যবসা করে, দিব্যি একটা সততার মুখোশ তৈরী করে, তার আড়ালে দুষ্কর্ম চালায়।

"এরপর টপাটপ সব ধরা পড়তে লাগল। বিশেষ করে ঘোর বর্ষায় ওরা একটু অসাবধান হয়ে পড়ত। ভালমানুষ সেজে ভদ্রলোকের বাড়িতে কোনো অছিলায় ঢুকে পড়ে, যা কিছু ভাল জিনিস সব সরাত। পুরুষরা তখনও বাড়ি ফেরেনি। মেয়েরা চ্যাঁচালেও শোনা যেত না, গেলেও প্রায় অন্য কোনো বাড়ি

থেকে সাহায্যকারীদের আসা-যাওয়া করার সাধ্য ছিল না। এই সময় ব্যাপারটা ঘটেছিল। শহরের শেষে মোড়ের মাথায় বড় বটগাছতলা ছাড়িয়েই খগেন সরকারের বাড়ি। সবাই জানত, তেজারতি করে তিনি বেশ টাকা করেছেন। যদিও বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না। বন্ধু লোক, তাই আমি নিজেও একটু চোখ রাখতাম। খগেনবাবু না-ফেরা অবধি বাড়িতে খালি কতকগুলো ছোট ছেলেমেয়ে আর দু-তিনজন গিন্নি।

"সেদিন বটগাছের তলায় পেঁছেছি, এমন সময় আকাশ কালো করে ঝমঝম বৃষ্টি। দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম এখান থেকে নজর রাখলে সবচেয়ে ভাল হয়। হঠাৎ কানে এল খট্ খট্ খট্ করে কড়ানাড়ার শব্দ। ভিতর থেকে বৌদি ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কে?' বাইরে থেকে একটা লোক বলল, 'মাঁ আঁমি! দঁরজাঁ খুঁলুন। বৌদি বললেন, কে আমি?' আঁমি গোঁ মাঁ, আঁমি!' ভিতর থেকে বৌমাদের ভয়ার্ত চিৎকার, 'খুলবেন না মা, নাকিশুরে কথা বলছে। ভূত ছাড়া কিছু হতে পারে না।'

"বাইরের লোকটা কাতরভাবে বলল, 'না গোঁ মাঁ, আঁমি রাঁসবিহারী।' বাঁবুর ফিঁরতেঁ দেঁরি হঁবে, তাঁই এই মঁধু আর গাঁওয়া-ঘিঁ পাঁটিয়েছেঁন।' দঁরজা খুঁলুঁন। জিঁনিঁস দিঁয়ে বাঁড়ি যাই।'

"তবু বৌমারা বলে 'ভূত! ভূত!' রাসবিহারী বলে, 'নাঁ, বৌঁদিঁদি, ছোঁটবেঁলা থেঁকে আঁমি খোঁনা। দোঁকানের রাসবিহারী আমি। বাঁবু এঁলে শুঁধোবেন! মঁধু আঁর গাঁওয়া-ঘিঁ এঁনেছি, মাঁ।'

"লোকটার বজ্জাতি দেখে আমি থ। ভূত সেজে গেরস্তর বাড়ি এসে, কয়েকটি মহিলা আর ছেলেপুলের ওপর হামলা করছে। শেষ পর্যন্ত মধু আর গাওয়া-ঘির জয় হল। হুড়কো খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমিও হতভাগা-টার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সর্বাঙ্গ চটে জড়িয়ে এসেছে, ভিজে চুপচুপে। ঝাঁপিয়ে পড়েই ঘাড়ে বুদ্দুম করে এক রদ্দা কষালাম। কষাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। মনে হল একটা বাতাসের দেওয়ালের ওপর রদ্দা মারলাম। মরিয়া হয়ে হাতড়াতে লাগলাম। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কিছু নেই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম বোধহয়। মুখে বৃষ্টির জলের ঝাপটা লাগতে সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসলাম। লণ্ঠন হাতে বৌদিদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। বললেন, 'মস্করা করার জায়গা পেলেনা ঠাকুরপো? বড়বৌমা যে আরেকটু হলেই খুন্তি তাতিয়ে মুখে ছ্যাঁকা দিতে যাচ্ছিল! তোমার আবার ফিটের ব্যামো কে জানত!'

"ঠিক সেই সময়ে মেঘ কেটে গেল, বিষ্টি থেমে গেল, চারদিকে জোছনা ফুটফুট করতে লাগল। চেয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই, কিচ্ছু নেই! না রাসবিহারী, না ভিজে চট, না মধু, না গাওয়া-ঘি। কী বলব বাপ, একে বারে তাজ্জব বনে গেলুম! ঠিক সেই সময়, বিকট শব্দের সঙ্গে হুড়মুড় করে বুড়ো বটগাছটা মুখ থুবড়ে, পথ জুড়ে, পড়ে গেল। সেই ইস্তক সূর্য ডোবার পর আমি গাছতলা দিয়ে একা কখনও যাই না।"

বটু বলল, "অবসর নিলে ঢের সময় পাবেন। তখন আপনার জীবনখাতাটার সবটা লিখে ফেলবেন। সাহিত্য-পুরস্কার কে ঠেকায়, দেখব।"

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রামযাত্রা

প্রত্যেক দরজায় তিলক এক কথা বলল।

আর দুটো টাকা দিন মা, তাহলেই রামযাত্রাটা নামিয়ে দিতে পারি। এ পাড়ায় তো কখনও কিছু হয় না। একেবারে নতুন ধরনের পালা মা। দিন দুটো টাকা।

তিলক এ পাড়ার বস্তিতে থাকে। বাবুদের মোটর ধোয়, সকলের ফাইফরমাস খাটে, একটা পেট, যা পায় তাতেই চলে যায়। পাড়ার মাতব্বরি করে।

দু-টাকা দু-টাকা করে প্রায় দেড়শো টাকা উঠল। শনিবার বিকাল থেকে রাস্তা জুড়ে মেরাপ বাঁধা শুরু হল।

চলাফেরার একটু অসুবিধা, তবে এ শহরে এ অসুবিধা কেউ গায়ে মাখে না। রাত আটটায় যাত্রা আরম্ভ, ছটা থেকে আসর উপচে পড়ার যোগাড় পাড়ার কোন ঝি বিকালে কাজে এল না। সেজেগুজে আসরে বসল।

ভদ্রমহিলার সংখ্যাও কম নয়। তাঁরা পিছনে চেয়ারে বসলেন।

আটটায় আরম্ভ হবার কথা, সাড়ে-আটটা বাজল, সীন ওঠার নাম নেই। তিলক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তার নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

পাড়ার সুজনবাবু তাকে পাকড়াও করলেন, কী হল তিলক? সাড়ে আটটা যে বেজে গেল।

তিলক কপাল চাপড়াল, আর বলবেন না বাবু আজ কৈকেয়ীর পালাজ্বরের দিন তা কি জানা ছিল। কয়েক গ্রেন কুইনিন অবশ্য দিয়েছি! জ্বর ছাড়বার মুখে, তবে বলছে কানে কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

তিলক দাঁড়াল না। ছুটে স্টেজের মধ্যে ঢুকে গেল!

নটায় কনসার্ট শুরু হল। কনসার্ট মানে বাঁশি আর হারমোনিয়াম দুটোর সুর দুদিকে। পাড়ার ছেলেরাই বোধহয় বাজাচ্ছে। সীন উঠল। রাজপ্রাসাদ অবশ্য বুঝে নিতে হবে। জরাজীর্ণ অবস্থা। খালি দুটো থাম দেখা যাচ্ছে।

কৈকেয়ী আর মন্থরা। মন্থরার পিঠে কুঁজ থাকবার কথা, কিন্তু মন্থরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কুঁজ লাগালে দশ টাকা বেশি দিতে হবে। কাজেই কুঁজ লাগানো সম্ভব হয়নি।

কৈকেয়ীর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। এখনও জ্বর রয়েছে। সে স্টেজের ওপর বসে পড়ে পার্ট বলতে আরম্ভ করল।

মন্থরা, জানিস তো দশরথের কাছে আমার তিনটে বর পাওনা। এক বরে ভরত রাজা হবে, দ্বিতীয় বরে রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হবে, আর তিন নম্বর বরে কী হবে কিছুতেই মনে আসছে না।

মন্থরার চোখমুখের ভাব সুবিধার নয়। দৃষ্টি উদাস। কী ভাবছে ভগবান জানেন।

সে কৈকেয়ীর দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বলল, কেন, ভুলে গেলে? তিন নম্বর বরে রাম আমাকে বিয়ে করবে।

ভদ্রদর্শকের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। এ আবার কী কথা? এমন কথা তো রামায়ণে নেই!

দু একজন বোঝাল, আজকাল নতুনভাবে রামায়ণের ভাষ্য তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া সূর্পণখা যদি লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চাইতে পারে, তাহলে মন্থরাই বা রামকে বিয়ে করতে চাইবে না কেন?

মন্থরার কথা কৈকেয়ীর বিশেষ কানে গেল মনে হল না। কুইনিনের তেজে তখনও তার দুকান বন্ধ।

বোধ হয় উল্টোই শুনল।

খেপে উঠে বলল, কী, এত বড় আস্পর্ধা? তুই আমার বাপের বাড়ির দাসী, আর আমার কথার ওপর কথা। আমি বলছি ভরত রাজা হবে, আর তুই বলছিস, রাম বড়, রাম রাজা হবে। তোকে আজই দূর করে দেব।

মন্থরা নাকি কানে কিছু শোনে না।

দূর করে দেব, কথাটা কিন্তু ঠিক কানে গেল।

মন্থরা বসে ছিল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

দূর করে দিবি? তুই দূর করে দেবার কেরে? তিলক হাতে পায়ে ধরে এনেছে, তাই এসেছি।

মন্থরা আর কথা বলবার অবকাশ পেল না। কৈকেয়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুলের মুঠি চেপে ধরল।

তবে রে, যত বর মুখ নয়, তত বড় কথা।

দুজনে ঝটাপটি, ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যেতেই যবনিকা ফেলে দেওয়া হল।

দর্শকদের হাসি আর থামে না।

লজ্জায় তিলক বাইরে বের হতে পারল না!

আধঘণ্টা পর সীন উঠল। দশরথ আর রাম। দুজনকেই বেশ মানিয়েছে। দশরথ সিংহাসনে বসে। সিংহাসন মানে টুলের ওপর রঙীন কাপড় ঢাকা দেওয়া।

বৎস রাম, এবার আমার ইচ্ছা তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি বাণপ্রস্থ নেব। মন্ত্রীকে ডেকে তার আয়োজন করতে বলেছি।

দশরথের গলাটা খুব চেনা চেনা ঠেকল। কথা বলার ভঙ্গীও। একটু পরেই চেনা গেল তার সংলাপে।

আমি অভিষেকের আয়োজন করতে শুরু করে দিয়েছি। গৌড়ের প্রজারা ইতিমধ্যেই আড়াই হাজার কিলো আলু এনে গুদামে জমা করেছে। আলু ছাড়া যে-কোনও অনুষ্ঠানই অচল। আলুর দম, বাঁধাকপি-আলুর তরকারি, আলুর চপ, আলু ভাজা।

আরো কতক্ষণ আলুর কীর্তন চলত কে জানে। বোধ হয় ভিতর থেকে প্রম্পটর ধমক দিতে দশরথ থেমে গেল।

তবে দশরথকে দর্শকদের সবাই চিনতে পারল।

পাড়ার বাজারের আলুওয়ালা। বিরাট ঝাঁকা নিয়ে যে বাজারে ঢোকবার মুখেই বসে থাকে।

দশরথের সময়ে যে কিলোর যুগ হয়নি, সেটা বেমালুম ভুলে গেছে।

এবার রামের পালা। রাম দশরথের কাছে এগিয়ে এসে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, পিতা, এই বয়সে আপনি বাণপ্রস্থ নেবেন, এ আমি কী করে সহ্য করব। আপনি সহস্র বছর সুখে রাজত্ব করুন। আমি আপনার পদসেবা করে ধন্য হই।

এর মধ্যে রাম বেশ ভালই পার্ট বলল। মিষ্টি গলা, গলায় জোর আছে।

সামনে বসা ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে উঠল।

দশরথ দেখল রাম খুব জমিয়ে নিয়েছে। তাই গলায় আবেগ দিয়ে বলতে শুরু করল, বৎস, পৃথিবীর এই নিয়ম। শুকনো পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজায়। পুরনো আলু শেষ হলে নতুন আলু ওঠে, তেমনি জোয়ানদের জন্য রাস্তা করে দেবার জন্য আমাদের মতন বুড়োদের সরে যেতে হয়।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দশরথ আলুর কথা ঠিক বলবে।

তুমি অরাজী হয়ো না বাপ।

এইখানে দশরথ কেলেঙ্কারি করল। তার শালগাছের মত ভারি একটা হাত রামের কাঁধের ওপর রাখল। সজোরে।

ব্যাস, রাম চিৎকার করে বসে পড়ল।

ওঃ, তোমাকে না বলেছি কাঁধে একটা ফোড়া আছে। গায়ে হাত দেবে না। আঃ, রক্ত বের হতে আরম্ভ হয়েছে। দুত্তোর, যাত্রা। এই রইল তোমাদের চুল, আর পোশাক। তোমাকে বাইরে পেলে দেখে নেব।

কথার সঙ্গে সঙ্গে রাম মাথার পরচুলা স্টেজের ওপর আছড়ে ফেলল। পোশাক টান মেরে খুলে দিল।

পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি। দেখা গেল, কাঁধের কাছটা রক্তে লাল হয়ে গেছে। তার মানে শ্রীরামচন্দ্রের ফোড়াটা ফেটে গেছে।

দশরথ চাপা গলায় কী বলার চেষ্টা করল, কিন্তু রাম তখন প্রলয় নাচ শুরু করেছে। কোন কথা শুনতে রাজী নয়।

ভিতর থেকে কতকগুলো লোক বেরিয়ে রামকে ঘিরে মঞ্চের মধ্যে নিয়ে গেল। তার মধ্যে তিলকও আছে।

এদিক দিয়ে কৈকেয়ী মঞ্চে প্রবেশ করল।

হে রাজন, আপনার কাছে দাসীর নিবেদন ছিল।

কৈকেয়ী শাড়ি পালটেছে। মুখেও নতুন করে রং মেখেছে। দুকানে ঝকঝকে দুল।

রামের ব্যবহারে দশরথ খুবই মুহ্যমান। এমন ছেলেকে বনবাসে পাঠাতে তিনি এখনই রাজী। এতবড় সাহস, বাপকে বলে বাইরে গেলে দেখে নেবে।

দশরথ কৈকেয়ীর দিকে চোখ ফেরাল।

কৈকেয়ী সুযোগ বুঝে ইনিয়ে-বিনিয়ে তিনটে বরের কথা নিবেদন করল।

রামায়ণের দশরথের মূর্চ্ছা যাবার কথা, কিন্তু এ দশরথ যেন খুশি হল। বিড় বিড় করে বলল, বনে পাঠালে ঠিক শাস্তি হবে না। আলুর চাষের সময়

যখন মাটি খোঁড়া হয়, তখন অমন ছেলেকে পুঁতে মাটি চাপা দেওয়া উচিত।

ভাগ্য ভাল, বিড়-বিড় করে বলার জন্য কথাগুলো দর্শকদের কানে গেল না।

কৈকেয়ী পাকা অভিনেত্রী। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল—

মহারাজ, রামকে ডেকে তাহলে বনবাসের আজ্ঞা দিয়ে দিন।

দশরথ ইঙ্গিতটা বুঝল। হুঙ্কার ছাড়ল।

কে আছ, রামকে পাঠিয়ে দাও।

রাম ঢুকতেই সারা আসরে হাসির তুফান ছুটল।

মাথায় ছোট, বহরে বড়, অমাবস্যার রং, ইয়া পাকানো গোঁফ, হৃষ্টপুষ্ট রামচন্দ্র গটগট করে ঢুকল।

বোঝা গেল আগের রাম নামতে রাজী হয়নি। নতুন লোককে পাকড়াও করে নামানো হয়েছে। লোকটিকেও চেনা গেল। মোড়ের রায়বাবুদের চাকর পাঁচু।

সে লজ্জায় দর্শকদের দিকে একেবারে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

কৈকেয়ী বলল, তোমার পিতার আদেশ শোন রামচন্দ্র।

দশরথ উঠে দাঁড়াল। চোখে একটা হাত চাপা দিয়ে বলল, তোমাকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাস দিলাম। এখনই চলে যাও।

রামকে বোধ হয় বলা ছিল, সে একদম কথা বলবে না। মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু রংচং-এ পোশাক পরে, জোরালো আলোর সামনে তার সব গোলমাল হয়ে গেল। কিংবা ঘুরে দাঁড়াতেই সামনে চেয়ারে-বসা রায়বাবুর দিকে বোধ হয় চোখ পড়েছিল।

রাম দুটো হাত আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর রেখে বাপকে বলল—

হুট করে যাও বললেই তো আর যাওয়া যায় না। বাবুকে বলতে হবে, গিন্নীমার হুকুম নিতে হবে, মাইনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আরও কী সব বলছিল, লোকের তুমুল হাসিতে সব চাপা পড়ে গেল।

এবারেও যবনিকা ফেলে দিয়ে মান বাঁচাতে হল।

ইতিমধ্যেই বারো আনা লোক উঠতে আরম্ভ করেছেন। পিছন দিক প্রায় খালি।

সবাই ভাবল এবার বোধ হয় যাত্রা বন্ধ হবে। অবশ্য আধুনিক যাত্রা। সীন ফেলার ব্যাপার রয়েছে। চারদিক খোলা আসর নয়, তিনদিন ঢাকা।

কিন্তু লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা এদের দেখাই গেল না। অথচ পয়সা দিয়ে এদের আনা হয়েছে।

মিনিট পনের। হট্টগোল একটু কমতেই সীন উঠল।

এ-সীনে কারও কোন কথা নেই। রাম, সীতা আর লক্ষ্মণ বনবাসে চলেছে। সীতাকে কোথা থেকে যোগাড় করা হয়েছে কে জানে। সে লম্বায় রামের কোমর পর্যন্ত। একদিক থেকে ঢুকে আর-একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

তাতেও বিপত্তি।

তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে সীতার পায়ের সঙ্গে লক্ষ্মণের পা বেধে আর একটু হলেই দুজনে উল্টে পড়ত।

কোনরকমে সামলে নিয়ে তিনজনে প্রস্থান করল।

এবারে শেষ দৃশ্য।

মন্থরার লাঞ্ছনা। ভরতের হাতে।

ভরত ঢুকতেই সব লোক হাততালি দিয়ে উঠল। হাততালি আর থামতে চায় না। এত উচ্ছ্বাসের কারণ ভরত সেজেছে তিলক।

বোধহয় আসল ভরত যাত্রার ব্যাপার দেখে পালিয়েছে, মান রাখতে তিলক নেমেছে ভরতের সাজে, কিংবা তিলকই ভরত সেজেছে গোড়া থেকে।

মন্থরা স্টেজের মাঝখানে বসে ছিল দুপা ছড়িয়ে, ভরত লম্ফঝম্ফ করে ঢুকল।

নীচ দাসী, তোর কুমতলবে দাদা রাম বনবাসে গিয়েছে, আজ আর তোর নিস্তার নেই।

মন্থরার ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা কাঠি নিয়ে নির্বিকারচিত্তে কান চুলকাচ্ছে।

এবার ভরত একটু বাড়াবাড়ি করল।

মন্থরার ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল, আজ তোকে যমালয়ে পাঠাব।

ব্যস, মন্থরা স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠল।

খোঁপা খুলে চুল পিঠের ওপর। দুটো চোখ রক্তবর্ণ। মুখে যেন খই ফুটছে।

তবে রে, তোর এত বড় সাহস, তুই আহ্লাদীর গায়ে হাত দিস। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

তিলক একটু থতমত খেয়ে গেল। এসব কথা বইতে নেই। বইতে আছে, মন্থরা ভয় পাবে, কাঁদবে, হাত জোড় করে বলবে রাজকুমার, ক্ষমা কর। আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। এমন কাজ কখনও করব না। কিন্তু তার বদলে এ-মন্থরা তো লাফাচ্ছে।

ভরত একবার শেষ চেষ্টা করল।

গলা বাড়িয়ে বলল, পাপীয়সী, এখনও নাকে খত দে, নইলে তোর শেষ।

ভরত নাগালের মধ্যে যেতেই মন্থরা তাকে জাপটে ধরলে।

তারপর ধোপা যেভাবে কাপড় আছড়ায়, সেভাবে ভরতের দেহটা স্টেজে আছড়াতে আছড়াতে বলল, আয়, কে কাকে, শেষ করে দেখি।

তারপর ধপধপ শব্দ আর ভরতের অর্তনাদ।

লোকেরা স্টেজে উঠে কোনরকমে মন্থরার কবল থেকে ভরতকে ছাড়িয়ে নিল।

ব্যাস, যাত্রা শেষ। পরে পাড়ার বৌঝিরা বলেছে, ও তিলক, এ রামযাত্রা না গঙ্গাযাত্রা ?

তিলক কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছে, ও দুটোর কোনটাই নয় মা। এ হল ভরতের গঙ্গাযাত্রা।

আশাপূর্ণা দেবী

কৈলাশে চা পান

মা দুর্গা কৈলাসে ভাঁড়ার ঘরের সামনে বসে পান সাজছিলেন। জয়া-বিজয়া কাছে বসে খয়ের সুপুরি কুচিয়ে দিচ্ছল; তা দিক, পান সাজাটি মা কারো হাতে দিতে রাজী নন, ভোলা মহেশ্বরের জিনিস বলে কথা! কে চুণ বেশী দিয়ে ফেলবে, কে খয়ের বেশী দিয়ে ফেলবে, বেচারী ভোলানাথের গাল পুড়বে, জিভ তিতোবে।

শত কাজের মধ্যে তাই মা দুর্গার নতুন এই এক কাজ বেড়েছে। গত বছর মর্তলোক থেকে এই পানের নেশাটি ধরিয়ে এসেছেন ভোলা মহেশ্বর।

অবিশ্যি চিরটাকালই তো তিনি বছরে বছরে ওই মর্তভূমিতে শ্বশুর-বাড়ির দেশে যাচ্ছেন আসছেন। তিনদিন ধরে খানাপিনা, বাজনা বাদ্যি, আলো রোশনাই, আর জগঝম্পয় ঝালাপালা হয়ে, দশমীতে কৈলাসে এসে বাঁচছেন, আর এসে মা দুর্গার কাছে তার বাপের বাড়ির দেশের লোকদের বাড়াবাড়ির নিন্দে মন্দ করছেন, শিখে টিখে তো কিছু আসছেন না কখনো। হঠাৎ গত বছরেই কি হল?

তাহলে খুলেই বলতে হয় ব্যাপারটা। চিরকালই পুজোয় কাঁচা চালের নৈবিদ্যির চূড়োর ওপর ফাঁকা পানের খিলি বসানো থাকে, পুরুত ঠাকুর তাই

'নমঃ নমঃ' করে নিবেদন করে সারেন, কিন্তু গতবারে' খেজুর বাগান সাইকেল ক্লাবের সার্বজনীন পুজোয় চোঙাপ্যান্ট আর নামা-বলী শার্ট পরা ভক্তরা হঠাৎ-এ দৃশ্য দেখে বলে উঠেছিল, 'এ কী ঠাকুর মশাই, পানের খিলি ফাঁকা কেন ? ঠাকুর দেবতার সঙ্গে ফাঁকির কারবার ? মশলা কই ?'

পুরুত বললেন, 'পুজো করে চুল পাকালাম বাবা, নৈবিদ্যির পান তো কখনো মশলা থাকতে দেখিনি, ফাঁকাই থাকে।'

'চোঙা প্যান্টরা বলল, 'না, 'না, ছি ছি; ওটা ঠিক নয় স্যার, এনে দিচ্ছি মশালা।'

সামনের পানের দোকান থেকে মশলা টশলা তো এনে দিলই, তার সঙ্গে আবার দিলীপের জর্দাও। বেশ তোয়াজি পান হল। কিন্তু মা দুর্গার তো ওসবে অভ্যেস নেই। একটা খেয়েই মাথা বনবন। তাড়াতাড়ি বাকি পান-গুলো মহাদেবকে দিয়ে বললেন, 'আপনি খান ঠাকুর, আপনার ভাঙ খাওয়া মাথা, দেখুন যদি না ঘোরে।'

খেলেন ঠাকুর আর সেই ঘুরলই মাথা।

মানে খেয়ে মাথাটি যাকে বলে একেবারে 'ঘুরে গেল,' ভাবলেন, আহা হা এ কী জিনিস! সিদ্ধি খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। মিঠে পানের সঙ্গে দিলীপের জর্দা! আহা! অতুলনীয়।'

চুপি চুপি বললেন, 'দুর্গা এই পান বানানোর ফরমুলাটা শিখে যেতে পার ?'

মা দুর্গা বললেন, 'ফরমুলা শিখে কী হবে ? কৈলাশে পানপাতা পাওয়া যাবে ?'

'পুঁতলে হয়না ?'

দুর্গা হাসলেন, 'এ কী লেবুগাছ, পেয়ারা গাছ যে, পুঁতলেই হল ? ওর চাষ আছে, তার নানান ঝঞ্ঝাট আছে, তবে বলেন যদি তো বস্তাকয়েক নিয়ে যেতে পারি নন্দী ভৃঙ্গীর মাথায় চাপিয়ে।'

শিব বললেন, 'ওরা দু'জনে আর কত পারবে ? তোমার জয়া বিজয়াকেও লাগিয়ে দাও।'

দুর্গা মাথা নেড়ে বললেন, না ওদের হাতে অন্য জিনিস থাকবে। নন্দী ভৃঙ্গী গন্ধমাদন বইতে পারে।'

ব্যাপার এই, মা দুর্গাও বছর দুই হল মর্তলোক থেকে একটি বদভ্যাস করে বসে আছেন, সেটি প্রকাশ করেন নি। রান্নাঘরের কোণে বসে সেরে নেন, আর জয়া বিজয়া পেসাদ পায়।

তা তারও একটা ইতিহাস আছে।

বসন্তপুরের বিখ্যাত মুখুয্যে বাড়িতে হচ্ছিল মায়ের পুজো, খুব রমরমা। কিন্তু মুখুয্যে কর্তার সেবছর শরীর খারাপ, ডাক্তার বলেছে 'উপোস চলবে না, অন্তত একটু চাও খাবেন।'

বরাবর কর্তা মহাষ্টমীতে উপোস করে আসছেন, এবার খেতে হবে, মন খারাপ। ছেলের বৌ একটা বড় পাথরের গেলাসে করে চা দিয়ে গেছে বিশুদ্ধ চা খেলে যদি উপোসের দোষ কিছুটা কাটে! মুখুয্যে কর্তা সেটি নাড়াচাড়া করছেন, মুখে তুলতে হাত উঠছে না, ছেলে বকাবকি করে গেল, কী বাবা এখনো খাননি?'

মুখুয্যে কর্তা তখন দেবীর সামনে গেলাশটা বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'তবে মা তুই আগে পেসাদ করে দে।'

অগত্যাই মাকে অলক্ষ্যে সেই চায়ে চুমুক দিতে হল, ব্যাস তারপরেই অস্থির! ঘোরতর চিন্তা, 'জয়া, খোঁজ নে এ জিনিস কোথায় পাওয়া যায় কী করে বানাতে হয়।'

অতঃপর চুপি চুপি মর্ত থেকে টিন কয়েক চা কৈলাসে নিয়ে এলেন! এবছরেও এনেছেন।

তা' রেখে রেখে না খেলে, ও আর ক'দিন? নন্দীভৃঙ্গীর চোখে পড়ে গেলে তো মিনিটে মিনিটে উনুনে কেটলী চাপাবে।

এই যে বস্তা বস্তা পান এল, তাও তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবু তো জয়া হিমালয়ের এক গভীর গহবরে, মানে প্রায় 'ডীপ ফ্রীজে' তুলে রেখে দিয়েছে পলিথিনের ঠোঙায় মুড়ে, তাই না পচে টচে যায়নি!

কিন্তু আর ক'দিন চলবে?

যতই মা দুর্গা গুনে গুনে খরচ করুন, সামনের পুজো পর্যন্ত কি আর পৌঁছবে? শিবঠাকুরের তাই মন খারাপ। ভাবছেন, বলবেন 'দুর্গা কাল থেকে, দুটোর বেশী পান খাবনা' এমন সময় হঠাৎ শিবের আসন টলে উঠল। চমকে বলে উঠলেন, 'নন্দী, দেখ তো কে কোথায় ডাকছে।'

নন্দী কৈলাসের উঁচু চুড়ো থেকে দেখে বলল, 'একটা লোক আপনার এক মন্দিরে হত্যে দিচ্ছে?'

'সেরেছে! আবার কী হল রে বাবা!....নন্দী, কোন মন্দিরে?'

নন্দী আরো বুক ঝুঁকিয়ে দেখল।

'আজ্ঞে জৈগ্রামে জল্পেশ্বরের মন্দির।'

'কী চায় লোকটা ?'

'প্রভু কী আর বলব ? মামলায় জিততে চায় ।'

শিবঠাকুর নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'আচ্ছা নন্দী, এদের নিয়ে কী হবে ? মামলা জিততে চায় তাও আমার মন্দিরে হত্যে ?'

'তা, কি আর করবে ? আপনি ছাড়া গতি কোথায় ? জিততে তো হবে ?'

'বলি লোকটা ভাল না মন্দ ?'

নন্দী মাথা চুলকে বলে, 'প্রভু আপনি তো সর্বজ্ঞ ।'

'হুঁ তার মানে তুমি একটু এনকোয়ারি করে দেখতেও পারবে না। তা' করে কি লোকটা তা' জানো ?'

'জানলাম আজ্ঞে, মানে, অবলোকন করে দেখেছি, লোকটা পানের কারবারি ।'

'অ্যাঁ !'

মহাদেব চ্যাঙ্গা হয়ে বললেন, 'কিসের কারবারি !'

নন্দী উদাস গলায় বলল, 'আজ্ঞে পানের। পানের ব্যবসা করে, নিজের পানে বরজও আছে—'

শিবঠাকুর ভাঙের নেশা ছেড়ে সোজা হয়ে বসলেন, 'বল কী নন্দী ? আর এই লোক অসুবিধেয় পড়েছে ? হত্যে দিচ্ছে ? যাও চটপট চলে যাও, স্বপ্না-দেশ দাও গে 'ভয় নেই'। আর এই নিয়ে যাও আমার একটু বিভূতি। এর মধ্যেই আমার একটু শক্তি মিশিয়ে দিলাম, দেখবে এই লোক যেন কিছুতেই না হারে। নামটা কী ওর ?

নন্দী আবার পৃথিবীতে উঁকি দিয়ে বলল, আজ্ঞে নাম বিরিঞ্চি ঘোড়েল ।'

বেশ, বেশ। মামলাটা কিসের ?'

'ওই যা হয় প্রভু ! জমিজায়গা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে জ্ঞাতির সঙ্গে ।'

'ঠিক আছে। ওই জ্ঞাতিটাকে গোহারান হারিয়ে দিবি। চটপট চলে যা ।'

মর্তে যাবার নামে তো নন্দী একপায়ে খাড়া। আহা ওখানে কত মজা, কত আমোদ ! পোড়া কৈলাসে সিনেমা আছে ? সার্কাস আছে ? মেলা আছে ? রাতদিন বাজী, বাজনা, সভা, ফাংশান আছে ?....হুঃ। তাড়াতাড়ি সেজে গুজে মা দুর্গাকে প্রণাম করতে যাচ্ছে, ভৃঙ্গী ধরল, 'বেশ মজায় আছিস দাদা ! ক'দিন থাকবি '

'কি জানি, ক'দিনে কাজ মেটে ! '

'এন্তার সিনেমা দেখবি তো ?'

নন্দী একটু হেসে ভৃঙ্গীর পিঠ চাপড়ে বলে যায়, 'মন খারাপ করিসনা, পরের

চান্সে তুই যাস।'

ভৃঙ্গী বেজার গলায় বলে, 'যাবনা কেন? মর্তে যখন মড়ক মহামারি হয়ে, বাবার আসন টলবে, তখন বাবা আমায় পাঠাবেন।'

গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

নন্দী মা দুর্গার অন্দরের দিকে এগোয়।

কিন্তু ওখানেও এক কাণ্ড!

ওখানেও পৃথিবীর এক ভক্ত আকুলি বিকুলি প্রার্থনায় মা দুর্গার আসন টলিয়েছে।

বিজয়া এনকোয়ারি করে জেনেছে জৈগ্রামের পঞ্চু ঘোড়েল নামের এক লোক মা দশভুজার মন্দিরে মাথা খুঁড়ছে, আর মোটা মোটা মানত করছে মামলা জিতিয়ে দিতে হবে।

মা দুর্গা প্রথমে ভারী রেগে উঠে ছিলেন, 'উঃ কী জ্বালা! জগতে এত জীব সৃষ্টি করলাম, এই মানুষগুলোর মত এত আবদেরে বায়নাবাজতো আর একটা দেখলাম না। বাঘ সিংহী হাতী উট সাপ ব্যাং মাছ, সবাইতো আমার সন্তান, তারা কে কবে আবদার করছে, 'মা আমার এই করে দাও!'....আর ওই মানুষ, রাতদিন ডাকাডাকি, আর দাও দাও। মা আমার অসুখ ভাল করে দাও, আমার বাড়ি করে দাও, গাড়ি করে দাও, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও, বড় চাকরী করে দাও, ভাল বিয়ে দিয়ে দাও, আমায় মান দাও, যশ দাও, রাজা করে দাও, মন্ত্রী করে দাও, লিস্টি ফুরোবে না। আবার মামলা মকদ্দমাতেও জিতিয়ে দাও উঃ।'

বিজয়া গোমড়া মুখে বলেছে, তা' যাকে যা শিখিয়েছ মা, সে তাই শিখেছে। অন্য সব জীব জন্তুকে 'ডাক' ছাড়া আর কিছুই শেখাওনি, তারা সেই ডাকই ছাড়ে, ঘোঁ ঘোঁ, মিউ মিউ, যিঁহি হিঁহি, হাম্বা হাম্বা! মানুষকে তুমি ডাকতে শিখিয়েছ, সে তাই করছে। রাতদিন ডাকছে। শুধু শুধু কি আর ডাকবে, তাই 'দাও দাও' করছে।'

মা দুর্গা রেগে বললেন, 'খুব যে কথা শিখেছিস? বছর বছর পৃথিবীতে গিয়ে এইটি হয়েছে, তা' যে ডাকছে, সে করে কী?'

বিজয়া খড়ি পেতে বলে, 'চায়ের ব্যবসা।'

মা দুর্গা চমকে বলেন, অ্যাঁ বলিস কী?'

'হ্যাঁ মা, শুধু ব্যবসাই নয়, তিন চারটে চায়ের বাগানও আছে তার।'

মা দুর্গা রেগে বলেন, 'আর এই লোককে তুই অগ্রাহ্য করছিস? ওকে

জিতিয়ে দিতে পারলে জীবনে আর তোকে পৃথিবী থেকে চা বয়ে নিয়ে আসতে হবেনা। যা—গিয়ে স্বপ্নাদেশ দিবি, ভয় নেই, তোকে জিতিয়ে দেব, তুই শুধু নিয়মিত আমায় চা সাপ্লাই করবি। মানে চায়ের পাতা দিয়ে পুজো দিবি।'

এতক্ষণে বোধহয় বুঝতেই পারছ, মা দুর্গা ওই চায়ের অভ্যাসটিই করে ময়েছেন।

বিজয়া যখন মা দুর্গার শক্তি কণিকা নিয়ে মর্তে নামতে যাচ্ছে, নন্দীর সঙ্গে দেখা। এ বলে কী ব্যাপার ?....ও বলে কী ব্যাপার ?

তারপর বোঝা গেল ব্যাপার, লড়াইটা শেষ পর্যন্ত শিবের সঙ্গে দুর্গার গিয়েই ঠেকছে !

বিরিঞ্চি ঘোড়েল হয়েছে শিবাশ্রিত। পঞ্চু ঘোড়েল দুর্গাশ্রিত। দুই জ্ঞাতি ভাই। একখানা তালুক নিয়ে লড়ালড়ি। এ বলে, 'ও তালুক আমার সাত পুরুষের,' ও বলে, 'ও তালুক আমার সাত পুরুষের।'....অথচ মিথ্যে কেউই বলেনা,

সাত পুরুষ আগের সেই চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়া ভদ্রলোক ? যিনি গাঁটের কড়ি খরচা করে কিনেছিলেন ওই জমিটি, সেই 'রজনী ঘোড়েল ? তিনি এই পঞ্চু ঘোড়েলেরও ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা, আবার বিরিঞ্চি ঘোড়লের ঠাকুরদার ঠাকুরদা অতএব এদের দু'জনেরই সমান দাবি। ....রজনী ঘোড়েলের দুই ছেলের বংশ দু' দিকে ছড়িয়ে এখন জ্ঞাতি শত্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই—জমিটার অধিকার নিয়ে ঘোর মকদ্দমা।

এ বলে, 'পানের চাষ আরো বাড়ানো দরকার ওই জমিটায় ভাল হবে।'

ও বলে, 'শুধু পাহাড়ের দেশেই চা বাগান হয়, বর্দ্ধমান জেলার মাটিতে বাগান হওয়ানো যায় কিনা, তার পরীক্ষা করব। জমি না হলে কোথায় পরীক্ষা ? পুকুরের জলে ?' দু'জনেরই যুক্তি আছে।

রাত্তিরে যে যার বাড়িতে ঘুমোচ্ছে হঠাৎ বিরিঞ্চি ঘোড়েলের মাথার কাছে দেববাণী, 'ওরে বিরিঞ্চি, নির্ভয়ে থাক, স্বয়ং বাবা ভোলানাথ তোর সহায়। তোর জিৎ মারে কে ?

ওদিকে পঞ্চু ঘোড়েলের মাথার কাছে তেমনি দেববাণী, শুধু হেঁড়ে গলায় নয়, মধুর কণ্ঠে, 'বাছা পঞ্চু, নির্ভয়ে থাক, তোর জয় মারে কে ? আমি তোর জয়ের জন্য আমার অনুচরী বিজয়াকে পাঠিয়েছি, আমার শক্তি দিয়ে। শুধু একটি শর্ত—।

পঞ্চু ধরফড়িয়ে উঠে বসে দিশেহারা হয়ে বলে, 'কী শর্ত মা, কী শর্ত ?'

'পরে বলব, আগে জেৎ।'

ব্যাস! পরের দিন দুই জ্ঞাতি ভাই পুকুর ধারে তড়পাচ্ছে, এ বলে 'মা স্বপ্নে আমায় ভরসা দিয়ে গেছেন, আমার জেতা মারে কে?'

ও তড়পাচ্ছে, 'বাবার ওপর কথা নেই, বাবা মায়ের গুরুজন, বাবা আমায় স্বপ্নে আশ্বাস দিয়ে গেছেন না জিতিয়ে ছাড়বেন না। ও জমি আমার হকের ধন মদন মোহন।'

দুর্গাশ্রিত পঞ্চু বলল, দেখা যাক কার হকের ধন।'

চলছে লড়ালড়ি।

দিনের পর দিন শুনানি চলছে উকিল ব্যারিস্টার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, জজ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকছেন। কারুর হারজিৎ নেই, কারুরই কেস দুর্বল নয়, দুজনেরই সাত পুরুষের জমি।

কোর্ট-কাছারি নাস্তানাবুদ।

একদিকে বাবার বিভূতি, অন্য দিকে মায়ের শক্তি। নন্দী আর বিজয়া দুজনেই যে যার মালিককে নিয়মিত ট্রাঙ্ককলে খবর দিচ্ছে, মামলার অবস্থা কি, কিন্তু হেলা দোলা নেই কারুর!

রেগে গিয়ে শিব বলেন, দুর্গা, এটা কী হচ্ছে? তোমার শক্তি সংবরণ কর। আমার ভক্তকে জিতিয়ে না তুললে নরলোকে আর প্রেস্টিজ থাকবে আমার?'

দুর্গাও জেদ ধরে বলেন, সে আমি কি জানি? আমার বুঝি প্রেস্টিজ রাখবার দরকার নেই? চিরটাকাল আমি শরণাগত দীনার্ত, পরিত্রাণ পরায়ণে—তা জানো না?'

শিব দুর্গার তর্কাতর্কির রোল কৈলাস থেকে স্বর্গে গিয়ে ওঠে তেত্রিশ কোটি দেবতা ছুটে এসে হাজির হন। কী হয়েছে?

ওঁরা তো তখন উত্তেজিত, শিবঠাকুর আর মা দুর্গা! জয়া আর ভৃঙ্গী ঘটনার আদ্যন্ত রিপোর্ট দেয়, এবং নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ব্যাপার মিটবে কী করে? মা বাবা দুজনেই সমান, কেউ তো কম যাননা? আজ যদি এ জিতবো জিতবো করে, কাল ও তেড়ে ওঠে। রোজ নতুন নতুন উকিল আনছে।'

'এত সব টাকা কড়ি পাচ্ছে কোথায়?'

'ওরাই জানে।'

তাইতো!

তেত্রিশ কোটির এক আলোচনা সভা বসে, কী করে 'মা বাবা' দু'জনেরই মান বজায় থাকে। কারণ মা দুর্গা বলেছেন, 'আমার ভক্ত হারলে আমরণ অনশন

করব।' আর শিব ঠাকুর বলেছেন, 'আমার ভক্ত না জিতলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লণ্ড ভণ্ড করে ছাড়ব।'

দুটোই সমান ভয়ের।

তেত্রিশ কোটি ভেবে হিমসিম, এমন সময় যমরাজের প্রবেশ। ডিউটিতে ছিলেন, আসতে দেরি হয়ে গেছে। বিবরণ শুনে সেফ্ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'এই কথা?' সব সমস্যার সমাধান আমার হাতে। মা বাবা দুজনেরই মান বজায় থাকবে। কালই আমার মোষটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

'কোথায়? কোথায়?'

কেন পৃথিবীতে, আদালতের সামনে রাস্তায়!'

দেবতাদের কথা অমোঘ, পরদিনই হয়ে গেল সমস্যার সমাধান। বিরিঞ্চি আর পঞ্চু দু'জনে একই সঙ্গে আদালত থেকে বেরিয়ে দু'জনকে কলা দেখিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে হাসছে, হঠাৎ চোখে অন্ধকার, কোথা থেকে যেন কালো মেঘের চাঁইয়ের মত বিশাল এক মোষ ছুটে এসে দু'জনের ওপর দিয়েই 'পাস' করে চলে গেল। দুজনেই স্রেফ্ কাদা!

রাস্তার লোকে তুলে হাসপাতালে পাঠাতে গিয়ে বুঝে পায়না কোনটা কার হাত পা।

গভীর অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে যখন আলোয় চোখ মেলল বিরিঞ্চি আর পঞ্চু, কিছুই চিনতে পারেনা। ....কী এ? আদালত? বাড়ি? হাসপাতাল উঠে বসতে যেতে দেখল পঞ্চুর মাথার কাছে মা দশভূজা, বিরিঞ্চির মাথার কাছে জল্পেশ্বর শিব।

শিব বললেন, 'বাবা বিরিঞ্চি, কোনো কষ্ট হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছিনা প্রভু।'

'তুমি কে মনে আছে?'

'কী আশ্চর্য মনে থাকবেনা? আমি বিরিঞ্চি ঘোড়েল, পানের কারবারি, দেশে বরজ লাগাব বলে জমি নিয়ে—'

ঠিক আছে, ঠিক আছে। 'সামান্য নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় কাজ কি? এই দ্যাখো অগাদ অফুরন্ত জমি পড়ে আছে, সব তোমার। শত শত পানের বরজ লাগাও।'

বিরিঞ্চি রেগে বলে, 'বললে তো ঠাকুর, এত জমির খাজনা দেব কোথা থেকে?'

'আহা খাজনা টাজনা তোমায় দিতে হবেনা, তুমি শুধু প্রতিদিন আমার

ওখানে কিছু করে পান পাঠিয়ে দেবে—'

বিরিঞ্চি উপুড় হয়ে পড়ে বলে, —সে আর বলতে, সে আর বলতে!.... কিন্তু প্রভু এই জায়গাটা কী ?'

কী আশ্চর্য ! বুঝতে পারছনা, কৈলাস।'

'বুঝবো আর কী করে ? কৈলাসে তো হরঘড়ি আসা যাওয়া নেই। তা হঠাৎ এখানে এসে পড়লাম কী করে ?'

বাবা মৃদু হেসে বলেন, সে কথা জিজ্ঞেস কোরোনা বৎস ! তবে তোমার কারবারের বাড়বাড়ন্ত করতে একটি বুদ্ধি দিই—তোমার ওই পান থেকে একদিন ছেষট্টি কোটি খিলি পান ভাল করে সেজে তেত্রিশ কোটি দেব দেবিকে দুটো দুটো খাইয়ে দাও। তারপর দেখবে।'

ওদিকে পঞ্চু ঘোড়েলের সঙ্গেও মা দুর্গার কথাবার্তা চলছে। মা দুর্গাও বলেছেন, 'ওই কৈলাস শিখরে অফুরন্ত জায়গা পড়ে আছে, যত পারিস চা বাগান কর বৎস, শুধু একটি শর্ত—আমায় নিয়মিত চা সাপ্লাই করবি। রান্নাঘরের কোণে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে আর ইচ্ছে নেই। ভাল চায়ের যোগান দিবি, মাঝে মাঝে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে ডেকে টী পার্টি দেবো। বুঝুন ওঁরা, আমার বাপের বাড়ির দেশের খাওয়া দাওয়াটি কেমন।'

পঞ্চু মহোৎসাহে বলে, ভাল চা যদি বলেন মা, এক্ষুণি টী পার্টী লাগিয়ে দিতে পারেন। শুধু যদি একটা ইয়া লম্বা আঁকশি পাই।'

'আঁকশি !'

মা দুর্গা আকাশ থেকে পড়েন, আঁকশি কী হবে।'

পঞ্চু ঘোড়েল একটু হাসি হেসে বলে, উ-ই নীচুতে দার্জিলিঙে—আমার দু' দুখানা চা বাগান পড়ে রয়েছে ও দুটোকে টেনে তুলে আনবো বিস্তর দেনাপত্তর করে এসেছি, শেষে কিনা আবার পাওনাদারেরা বেচে কিনে নিয়ে নেবে। তার আগেই রাতারাতি—

মা দুর্গা অবাক হয়ে বলেন, 'আঁকশি দিয়ে গোটা দুটো বাগান তুলে আনতে পারবি ?'

পঞ্চু গলবস্ত্রে বলে, 'তোমার দয়া আর তোমার আঁকশি, এ পেলে গোটা পৃথিবীখানাই তুলে আনতে পারি মা, তা তুচ্ছ দু'খানা বাগান ?....নাও বার কর আঁকশি, আজই লাগিয়ে দাও টী পার্টি।'

যে কথা সেই কাজ, লম্বা এক আঁকশি লাগিয়ে চা বাগান দুখানা তুলে আনল পঞ্চু। একেবারে কুলি, কামিন, মায় তাদের ঝুড়ি চুবড়ি সমেত।...নিজের

বাগান নিজের লোকজন, চিনতে ভুল হয়না। তাছাড়া কৈলাসের একেবারে সরাসরি নীচেই তো দার্জিলিং অসুবিধে হলনা টেনে তুলতে।

টী পার্টি দিলেন না দুর্গা, খেয়ে তেত্রিশকোটি দেবতা একেবারে বিভোর। ঝপাঝপ টন টন চায়ের অর্ডার দিয়ে ফেললেন পঞ্চুকে।

ওদিকে বাবা ভোলানাথও বসে নেই, তিনি বিরিঞ্চিকে তাতাচ্ছেন, 'বিরিঞ্চি, আবারও যে সেই হারা জেতা !....পঞ্চু জিতে যাচ্ছে—'

বিরিঞ্চি মুচকি হেসে বলে, ক্ষ্যাঁপা ঠাকুর, ক্ষেপেছেন ? পঞ্চার চাল আমি টের পাইনি ? আমি আগেই নন্দী ভৃঙ্গী দুই দাদাকে পাঠিয়ে আমার বারুইপুরের তিনখানা বরজই উপড়িয়ে এনেছি।....ছেষট্টি কেন একেবারে বাহাত্তর কোটি খিলি পান মজুত রেখেছি, টী পার্টির শেষে মুখশুদ্ধির জন্যে। দেবতা পিছু এক গন্ডা করে পান ধরে দেব।'

যে কথা সেই কাজ !

পানও ফেলনা হলনা। দেবদেবী মহলে কাড়াকাড়ি, আর অর্ডার দেওয়া দিইর হুড়োহুড়ি।

তদবধি কৈলাসে চা আর পানের চলন। মরে অমর হয়ে যাওয়া পঞ্চু আর বিরিঞ্চি, সমস্ত কৈলাস ক্ষেত্র জুড়ে চায়ের বাগান, আর পানের বরজ করে ফেলে অবিরত তাদের তদ্বির করে চলেছে, আর যাঁরা খাবার, তাঁরা খেয়ে চলেছেন।

অজেয় রায়

ফেকলুদার গাড়ি

সেদিন স্কুলে ছুটি ছিল! সকাল এগারোটা নাগাদ কয়েক রাউণ্ড গুলি খেলার পর দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস রোডে বাঁড়ুজ্যেদের রকে বসে আড্ডা দিচ্ছিল অন্তু, ছোটন, শিবু। এমন সময় ভজা এল।

ভজা কাছে এসেই সতর্ক চোখে চারপাশটা দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "এই যে, তোদেরই খুঁজছিলুম। শোন, গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে আসবি একদিন? বিনি পয়সায়। বাসে-ট্রেনে নয়, প্রাইভেট মোটরে। বলে-কয়ে ম্যানেজ করেছি। পরশু যাব। রোববার""

"কোথায়?" তিনজনে সবস্বরে জিজ্ঞেস করে।

ভজা বলল, "বেশি দূরে নয় অবিশ্যি, টিটাগড়ে। ব্যারাকপুর লাইনে। সকালে বেরোব। বিকেলে ফিরে আসব।"

"কার গাড়ি?" "কাকে ম্যানেজ করেছিস?" "আর কে কে যাবে?" পরপর অনেকগুলো প্রশ্ন হয়।

ভজা বলল, „আমরা চারজন আর ড্রাইভার। মানে গাড়ির মালিক স্বয়ং। আর কেউ নয়। নির্ঝঞ্ঝাট তোফা ট্রিপ। উনি একটা কাজে যাবেন টিটাগড়। গাড়ি ফাঁকা যাবে কেন? তাই আমাদের সঙ্গে নিতে রাজি করিয়েছি।"

"কার গাড়ি ?" জিজ্ঞেস করে অন্তু।

"অম্বুজাক্ষবাবুর, মানে ফেকলুদার। টিটাগড়ে ওঁর শ্বশুরবাড়ি। কী একটা কাজে যাবেন। আসলে নতুন গাড়ি কিনেছেন কিনা, তাই একবার দেখিয়ে আসতে চান।"

"অ্যাঁ, ফেকলুদার!" অন্তু ছোটন শিবু তিনজনেরই চোখ বড়-বড়।

শিবু বলল, "ফেকলুদার গাড়িতে অত দূর! উঁহু, খুব রিস্ক।"

"কেন, কিসের রিস্ক ?" ভজা তেড়ে ওঠে।

অন্তু মাথা চুলকে চিন্তিতভাবে বলল, "তা একটু রিস্ক আছে বইকী। কেমন জানি টাল খেতে-খেতে গাড়ি চালান।"

"সে প্রথম-প্রথম চালাতেন। এখন দিব্যি ড্রাইভ করেন। আমি নিজে চড়ে দেখেছি।" ভজা দাবড়ে দেয়।

"তা বেশ। কিন্তু যদি বারবার গাড়ি ঠেলতে হয় ?" ছোটন প্রশ্ন তোলে।

"হবে না," ভজা অভয় দেয়। "ফেকলুদা বলেছেন ইঞ্জিনের ওই ডিফেক্টটুকু ঠিক করে ফেলবেন। এঃ, তোদের বেশি বেশি। নেহাতই যদি দু-একবার ঠেলতেই হয় কয়েক পা, কী এমন কষ্ট রে ? ননীর পুতুল সব! এদিকে ফ্রিতে এতটা বেড়াবি। ফেকলুদার শ্বশুরবাড়িতে ফাসক্লাস খাওয়াবে বলেচে। আর কী চাই ? শোন্, ফেকলুদা প্রোগ্রাম ঠিক করেছেন, সকালে টিফিন করে বেরোব। দুপুরে ওঁর শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্চ। তারপর খানিক রেস্ট নিয়ে ব্যাক।"

অন্তুরা দোটানায় পড়ল। বাসে-ট্রামেই তারা ঘোরে। কারও নিজস্ব মোটরে চেপে বেশি দূর ভ্রমণ তাদের ভাগ্যে জুটেছে কদাচিৎ। ফেকলুদার শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্নটাও টানছে। তবু মনে খচ্‌খচ্। ফেকলুদার গাড়িতে যাওয়া কি নিরাপদ হবে ? ঝামেলায় পড়বে না তো ? তবে ভজা যখন অভয় দিচ্ছে আর সঙ্গেও যাচ্ছে।

একটা প্রশ্ন ছোটনের মাথায় আসে। বলে, "আচ্ছা, শ্বশুরবাড়িতে ফেকলুদা কি একা যাবেন ?'

"হ্যাঁ।" জানায় ভজা।

"কেন, বউদি আর ওঁদের মেয়ে যাবে না ?"

"নাঃ বউদির কাজ আছে। ফার্নিচার রং করাবেন। ওঁরা আর একদিন যাবেন। কিন্তু ফেকলুদা আর ওয়েট করতে রাজি নন। ওঁর এক শালা নাকি গাড়ি কিনেই এখানে ড্রাইভ করে এসে চাল মেরে গিয়েছিল। ফেকলুদার

বদলা চাই। বউদিরা পরে যেতে চান, যাবেন। ফেকলুদার এই রোববারেই সুবিধে। আবার কখন সময় পাবেন ঠিক নেই। আমরা না গেলে একাই যাবেন।"

"ঠিক আছে, যাওয়া যাবে, কী বলিস ?" শিবু দোনোমনো ভাবটা ঝেড়ে ফেলে, অন্তু ও ছোটনের দিকে তাকিয়ে বলে।

"অলরাইট," অন্তু ঘাড় নেড়ে বলে। ছোটনও সায় দেয়। ভজা বলল, "শুধু আমরা চারজন। পাড়ার ছেলেরা আর কেউ যেন আগে না জানতে পারে। তা হলে আরও অনেকে যেতে চাইবে। ফেকলুদাও বিগড়ে যাবেন। কাউকে নেবেন না। আমাদের সবার যাওয়াই ভেস্তে যাবে চুপচাপ বাড়ি থেকে পারমিশন নিয়ে রাখিস, ব্যস।"

মোটর চেপে বেড়িয়ে আসা তো আনন্দের ব্যাপার। তবু ফেকলুদার গাড়ি চড়তে অন্তুদের এত দ্বিধা কেন? কারণটা বুঝতে হলে ফেকলুদা এবং তাঁর মোটরের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা দরকার।

ফেকলুদার ভাল নামটা ভারিক্কি। শ্রীঅম্বুজাক্ষ বরাট। এ-পাড়ায় অনেক দিনের বাসিন্দা। বয়স বছর বত্রিশ। শ্যামবর্ণ, রোগা চেহারা। লম্বাটে মুখে নাকের নীচে একচিলতে গোঁফ। স্বভাব হাসিখুশি। ফেকলুদার একটা ছাপাখানা আছে ভবানীপুরে। ইদানীং ব্যবসায় ভাল আয় হচ্ছে। বিশেষত ওঁর প্রেসের এলাকায় দু' বছরে পরপর দুটো ইলেকশন হওয়ায় ইস্তাহার ছাপিয়ে প্রচুর পয়সা কামিয়েছেন। এরপর ফেকলুদা একটা মোটরগাড়ি কিনে ফেলেছেন। গাড়ি নতুন নয়, পুরনো, কয়েক হাত-ফেরতা। কচ্ছপের আকৃতির কালো রঙের ছোট্ট গাড়ি। ফেকলুদা অবিশ্যি বলেছেন যে, নতুন না হলেও খাস বিলিতি জিনিস, আজকালকার নতুন গাড়িকে টেক্কা দেয়।

গাড়ি কেনার আগে কয়েকদিন যাবৎ ফেকলুদাকে মোটর চালানো শিখতে দেখে পাড়ার লোক অবাক হয়েছিল। মোটর ট্রেনিং কারগুলিকে বিলক্ষণ চেনে লোকে। এল-মার্কা পাউরুটি গড়নের গাড়ি। পিছন দিকে দু-সারি বেঞ্চে উদ্বিগ্ন-মুখ কিছু আরোহী। অতি সাবধানে এগোয়। এমনি চলন্ত গাড়িতে পাড়ার লোকের চোখে কয়েকবার পড়েছেন ফেকলুদা, কখনও ড্রাইভারের পাশে, কখনও বা স্টিয়ারিং হুইল ধরে। উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল গাড়ি কেনার পর।

নিজের গাড়ির পিছনে 'এল' লেখা বোর্ড লাগিয়ে ফেকলুদা নিজেই গাড়ি চালিয়ে ঘুরতে শুরু করেছেন মাসখানেক হল।

প্রথম দিন-পনেরো ফেকলুদার গাড়ি আসতে দেখলেই পাড়ার লোক চটপট

রাস্তা থেকে ফুটপাতে উঠে পড়ত! যারা ফুটপাত দিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলেছে, তারা যথাসম্ভব অন্যধারে সরে যেত। এখন অবশ্য তাদের ভয়টা কমেছে, তবু পুরোপুরি আস্থা জন্মায়নি। ফেকলুদার গাড়ি আসতে দেখলে সবাই সতর্ক দৃষ্টি রাখে, যতক্ষণ না গাড়িটা পেরোয়।

ফেকলুদার এ-সবে দৃকপাত নেই। গাড়ি চালাতে চালাতে চেনা কাউকে দেখলেই তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাসেন। গাড়ির স্পিড কমিয়ে আহবান জানান লিফ্‌ট দেবার! লোকে অবশ্য সবিনয় তাঁর আহবান এড়িয়ে যায়।

ফেকলুদার গাড়ি চড়তে পাড়ার লোকের আগ্রহের অভাব আর একটা কারণে। ফেকলুদার গাড়ির একটা বদনাম রটে গেছে। গাড়িটা নাকি কখনও-কখনও স্টার্ট নিতে চায় না। তাকে তখন ঠেলা দিয়ে স্টার্ট করাতে হয়।

গাড়ি দিব্যি চলছে, থামছে। ফের চলছে, থামছে। হঠাৎ কী যে মর্জি হয়, একেবারে নট-নড়নচড়ন। তখন ঠেলা দিয়ে খানিক গড়িয়ে নিয়ে যাবার পর বার দুই, হেঁচকি তুলে ইঞ্জিন ডাক ছাড়ে।

গাড়ির এই খুঁত যথাসম্ভব গোপন রেখেছিলেন ফেকলুদা। পাড়ার ভিতরে তিনি কদাপি স্টার্ট বন্ধ করতেন না। প্রয়োজনে ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়িতে বসে কথাবার্তা সারতেন। তবু ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল।

ইন্দুবাবু একদিন জানালেন যে, তিনি দেখেছেন, হাজরা মোড়ে কয়েকটি ছোকরা ফেকলুদার গাড়ি ঠেলছে। এমনি ঠেলতে ঠেলতেই গাড়ি স্টার্ট নিল। এমন রিপোর্ট আরও একজনের মুখে মিলল। মহাদেবদা ফেকলুদার গাড়ি ঠেলতে দেখেছেন কলেজ স্ট্রিটে। বদনামটা চরমে উঠল বদি মুখুজ্যের রিপোর্টের পর। মুখুজ্যেমশাই মর্নিং ওয়াকে যান প্রতিদিন। ফেকলুদার বাড়ির কাছে থাকেন। ভোরে বেরিয়ে মুখুজ্যে দ্যাখেন, ফেকলুদা বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে বেরোচ্ছেন। মুখুজ্যেমশাইকে ডাক দেন ফেকলুদা, "লেকে যাচ্ছেন তো? আমিও যাচ্ছি। আসুন না গাড়িতে একসঙ্গে যাই।"

ফেকলুদার গাড়ির বিচিত্র মেজাজের খবর জানতেন না মুখুজ্যে। সানন্দে তিনি রাজি হন। ইঞ্জিন না বন্ধ করে গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দেন ফেকলুদা। মুখুজ্যেমশাই ওঠেন।

লেকে গাড়ি রেখে এক চক্কর হণ্টন দিয়ে ফেরার সময় ফ্যাসাদ। বাহন আর চলে না। তখন মুখুজ্যেমশাইকে অন্য লোকদের সঙ্গে গাড়ি ঠেলে স্টার্ট করাতে হয়েছিল। এই খবর রটে যাবার পর পাড়ার কেউ আর ফেকলুদার মোটরে উঠতে চায় না। পাড়ার লোক কানাকানি করে যে, এই ঝামেলার ভয়েই নাকি

ফেকলুদার নিজের বাড়ির লোকও পারতপক্ষে ওই গাড়িতে চড়ে না। গাড়ি কেনার দিন-কুড়ি বাদে মাত্র ভজাকেই দেখা যেতে লাগল মাঝে-মাঝে ফেকলুদার পাশে বসে ওই গাড়ি চেপে চলেছে।

ভজা বলত, "ওটা লাকের ব্যাপার। আমি তো আট-দশ বার চাপলাম। একদিন মাত্র গাড়ি বিগড়েছিল।"

পাড়ার ছেলেরা লক্ষ করেছিল যে, এই সময়ে ভজার আইসক্রিম, ঝালমুড়ি খাওয়াটা বেশ বেড়েছে। দেবু একদিন নিজের চোখে দেখেছে, ভজা একটা চকোলেট-আইসক্রিমের ডগা চুষছে, আর ফেকলুদা তার দাম মেটাচ্ছেন। সুতরাং তাদের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, ভজাকে চাপিয়ে নিজের গাড়ির পাবলিসিটি দিতে ফেকলুদা নির্ঘাত ঘুষ দিচ্ছেন ভজাকে। ভজা অবিশ্যি এসব কথা উড়িয়ে দিত। বলত, "তোরা ভিতু, তাই উঠিস না। নতুন চালাচ্ছেন কিনা। এক বছর যাক, তখন ওঁর গাড়িতে চাপতে ঝুলোঝুলি করবি। আমার কলজে তোদের মতো দুবলা নয়। ভাবছি ওঁর কাছে ড্রাইভিংটাও শিখে ফেলব।"

ক্লাস টেনের ছেলে। ছুটির দিনে বেড়াতে যাবে চেনা লোকের বাড়িতে। তাই বেড়াতে যাবার অনুমতি মিলতে চার বন্ধুর কারও আটকাল না। তবে দু-একটা ছোট্ট মন্তব্য শুনতে হল।

ভজার বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, "কে ড্রাইভ করবে, ফেকলু ?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ও পারবে অতটা যেতে ? নতুন শিখেছে।"

"এখন বেশ চালান," ভজা ভেকলুদার হয়ে ওকালতি করে।

"হুম।" ভজার বাবার মনের মেঘ পুরো কাটে না। তবে আপত্তির করেন না। বলেন, "বেশ, যাও, বলছ যখন পারবে। কিন্তু ওই এল-মার্কা বোর্ডটা এখনও গাড়ি থেকে খোলেনি কেন ?"

ছোটনের কাকা বাঁকা হেসে বললেন, "ফেকলুর গাড়িতে যাবি ? গাড়ি ঠেলে ঠেলে গায়ে ব্যাথা হয়ে যাবে দেখিস। বাস-ভাড়াটা সঙ্গে নিস। শেষমেশ একদম না-চললে ফিরবি কী করে ?"

অন্তু ও শিবুর বাড়িতেও ফেকলুদার গাড়িতে যাওয়া নিয়ে কিঞ্চিৎ উদ্বেগ দেখাল। যদিও যাবার অনুমতি মিলল !

রবিবার সকালে দেশপ্রিয় পার্কের পশ্চিমে উলটো দিকের ফুটপাতে জড়ো হল ভজা, অন্তু, শিবু, ছোটন। ভজা বলে রেখেছিল, "পাড়ার ভিতরে গাড়িতে উঠব না, যদি আর কেউ সঙ্গে যাবে বলে বায়না ধরে ? ফেকলুদা তাঁর শ্বশুর-

বাড়িতে নাকি খবর পাঠিয়েছেন, শুধু চারজন সঙ্গে যাবে। হঠাৎ কেউ বাড়তি গেলে ওদের অসুবিধে হতে পারে।"

সাড়ে সাতটায় ফেকলুদা গাড়ি চালিয়ে হাজির হলেন নির্দিষ্ট জায়গায়। গাড়ি থামল ফুটপাত ঘেঁসে, তবে ইঞ্জিন বন্ধ হল না। গাড়ির দরজা খুলে চটপট ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল চার বন্ধু, গাড়ি ফের চলল।

ভজা বসেছে ফেকলুদার পাশে, সামনে। বাকি তিনজন পেছনের সিটে। গাড়ি এগোচ্ছে বটে, তবে যাকে বলে শম্বুক গতিতে। পাশ দিয়ে অন্য প্রাইভেট-কার, বাস, লরি সব্বাই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মায় একঠা বাইসাইকেল অবধি স্পিডে হারিয়ে দিল ফেকলুদার গাড়িকে। রীতিমত প্রেস্টিজ যাচ্ছে অন্তুদের। কিন্তু উপায় কী? বোঝা গেল, ভিড়ের রাস্তায় এর চেয়ে জোরে যেতে ফেকলুদার ভরসা নেই। তিনি আড়ষ্ট ভাবে স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে রয়েছেন।

স্পিড যাই হোক, নিশ্চিন্তে গা ছড়িয়ে মোটর চাপার ফুর্তিতে ছোটনের গলা দিয়ে গান বেরিয়ে গেল, 'চল চল চল। ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...'

"সাইলেন্স," ফেকলুদার ধমক।

ভজা ঘাড় ফিরিয়ে ইশারা করল, চুপ। অর্থাৎ কনসেনট্রেশন নষ্ট হলে মুশকিল হতে পারে। অতএব....

যাব্বাবা, আচ্ছা গেরো! থাকো মুখ বন্ধ করে। এই সামান্য গানের শব্দে যদি চালাতে না পারে, তা হলে বাস বা প্রতিমা বিসর্জন পার্টির ড্রাইভাররা চালায় কী ভাবে? যাই হোক, অ্যাকসিডেণ্টের ভয়ে তিনজনে আর কথা না বলে ব্যাজার মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়ে ফেকলুদা একটু সহজ হলেন। বি, টি, রোড মস্ত চওড়া সিধে রাস্তা। তাই দিয়েও গাড়ি ছুটছে বটে তবে কলকাতার রাস্তার মতন আঁকাবাঁকা নেই। ফেকলুদা নিজে থেকেই বললেন হেসে, এবার তোমরা গাইতে পারো। নো প্রবলেম।"

অন্তু শিবু ছোটনের গানের মুড চলে গিয়েছিল। তবে এবার তারা গল্প জুড়ল!

খানিক এগিয়ে ফেকলুদা বললেন, "একবার চা খেতে হয়।"

"চা, কোথায়? জিজ্ঞেস করে ভজা!

"এই রাস্তাতেই কোনও চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে যাই।"

ভজা একটু ভেবে বলল, "বেশ।"

রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানের কাছে গাড়ি থামালেন ফেকলুদা।

ফেকলুদার মুখ থেকে কথা বেরোবার আগে ভজাই অর্ডারটা দিল, "পাঁচ কাপ চা আর দুটো করে নিমকি বিস্কুট দিন।"

চা-বিস্কুট খাওয়া হল। অতঃপর সগর্বে মোটরে আরোহণ। ফেকলুদা বার-কয়েক স্টার্ট মারলেন, ফস্ ফস্ ফস্। ইঞ্জিন গর্জাল না। ফেকলুদা কাতর চোখে ভজার দিকে তাকালেন। ভজা তার বন্ধুদের বলল, "চ, একটু ঠেলে দিই। ইঞ্জিন গড়বড় করছে। গাড়িটা দেখছি ঠিকমত সারায়নি।"

"হুঁ," ফেকলুদা সায় দিলেন।

নিতান্ত নগন্য চায়ের দোকানের মালিক, তার বছর পনেরোর ছোকরা কর্মচারী এবং জনাতিনেক চা-পানরত স্থানীয় লোক এমন গাড়ি চড়া খদ্দেরদের আগমনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এখন সেই আরোহীদের গাড়ি ঠেলতে দেখে তারা বেজায় মজা পেল। রগড় দেখতে আরও কয়েকজন পথচারী জুটে গেল। দর্শকদের অনেকেই দাঁত বের করে হাসছে।

রাগে গা রিরি করছিল অন্তুদের, অথচ নিরুপায়।

স্টিয়ারিং হুইলে গম্ভীরবদন ফেকলুদা। পেছনে প্রাণপণে গাড়ি ঠেলছে অন্তুরা। ঠেলা খেয়ে গাড়ি এগোয়। দর্শকদের গোটা দলটা মায় দোকান ফেলে দোকানিসুদ্ধ মোটরের পিছু নিয়েছে। নানান রসালো মন্তব্য কানে আসে।

"ওরে, এটা ট্রলি-মোটর। ঠেলে নিয়ে নিয়ে লাফিয়ে চড়ে বসবে। পেট্রোল বাঁচে।"

কয়েকজন উৎসাহী বাইরের লোক অন্তুদের সঙ্গে ঠেলতে হাত লাগায়। আওয়াজ ওঠে "মারো জোয়ন হেঁইও। আউর থোড়া হেঁইও।"

গাড়ি গড়াতে গড়াতে একবার ভটভট করে ওঠে। হয়েছে, হয়েছে। জনতার উল্লাস। কিন্তু ব্যস, ফের, ঝিমিয়ে পড়ে ইঞ্জিন। ফলে আবার ঠ্যালো। বার দুই ফল্স দেওয়ার পর গাড়ি সত্যি স্টার্ট নিল।

"কুইক।" হাঁক দিলেন ফেকলুদা। অন্তুরা ছুটে গিয়ে গাড়িতে ওঠে। দর্শকদের করতালি পিছনে ফেলে ফেকলুদার মোটর ছুটল।

মিনিট-পাঁচেক গুম হয়ে থাকে অন্তু ছোটন শিবু। ভজা একবার মন্তব্য করে, "গাড়িটা কিস্সু সারায়নি, স্রেফ ঠকিয়েছে।"

"হুম।" মাথা নাড়লেন ফেকলুদা।

মিনিট দশেক বাদে গাড়ি চালাতে চালাতে ফেকলুদা ঢোক গিলে বললেন, "ভজা, আমি একটা পান খাব।"

"পান!"

"হ্যাঁ ভাই। চায়ের মিনিট-দশ-পনেরো বাদে একটা পান না খেলে আমার শরীর কেমন আনচান করে। অভ্যেস।"

ফেকলুদার ঘন ঘন চা ও পান চলে, জানত ভজারা। কিন্তু এই বিশেষ অভ্যেসটির কথা জানত না।

"বেশ, খান না পান," ভজা বলে।

"কিন্তু তা হলে যে গাড়ি থামাতে হয়।"

"কেন?" বলল ভজা, "আপনার ডিবেটা কোথায় আছে বলুন। আমি একটা পান বের করে আপনার মুখে দিয়ে দিচ্ছি।"

"সরি। তাড়াহুড়োয় ডিবেটা আনতে ভুলে গেছি," কাঁচুমাচু ফেকলুদা জানাল।

"তা হলে কী করবেন?"

"কোনও দোকান থেকে পান কিনে নিই।"

"থামালে যে গাড়ি চলবে না।" ভজা বিরক্ত!

"কী করব ভাই? আমার মাথা ভোঁভোঁ করচে। একটা দোক্তাপান না খেলে নয়। অন্য সময় হলে না হয় আরও খানিকক্ষণ কাটিয়ে দিতাম, যা-হোক করে। কিন্তু গাড়ি চালাচ্ছি। এখন নার্ভ স্টেডি না থাকলে....। ওই চায়ের দোকানের কাছে পানের দোকান ছিল না, তা হলে তো ওখানেই কিনে নিতাম।"

আঁতকে ওঠে অন্তুরা। খেয়েছে, অ্যাকসিডেন্ট না করে বসেন। বরং খেয়ে নিন পান। না হয় ঠেলব গাড়ি।

ভজা বলল, "আচ্ছা, তা হলে পানের দোকানে গাড়ি থামান। তবে দোকানের কাছে নয়, একটু দূরে ফাঁকায় রাখবেন।"

পানিহাটির কাছে অমনি এক জায়গায় গাড়ি থামল।

ফেকলুদা কয়েক খিলি পান কিনে, একটা মহানন্দে চিবুতে চিবুতে অন্যগুলো ঠোঙায় পুরে রাখলেন গাড়িতে। এবারও গাড়িকে ঠেলে ঠেলে স্টার্ট দেওয়া হল। খানিক ফাঁকায় হলেও কিছু পথচারী দর্শক ঠিক জুটে গিয়েছিল। তাদের গা-জ্বালা-করা কিছু কথাও হজম করতে হল চারজনাকে।

ইঞ্জিন চালু হতে গাড়িতে উঠেই ভজা বলল, "আর কোথাও থামবেন না। সোজা টিটাগড়।"

"আরে না, না," ফেকলুদার আশ্বাস, "আর থামি? খেপেচ!"

ফেকলুদা কথা রাখলেন। একেবারে শ্বশুরবাড়ির গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলেন। পথে ভজাকে দু'বার ফেকলুদার মুখে পান ঠুসে দিতে হয়েছিল।

মোটরসমেত জামাইকে ফেকলুদার শ্বশুরবাড়ির লোক হইহই করে অভ্যর্থনা জানাল। ফেকলুদা সদম্ভে নামলেন গাড়ি থেকে। পিছু-পিছু ভজারা চারজন।

"এত দেরি হল যে ?" শাশুড়ির প্রশ্ন।

"এই মানে সবাই জড়ো হয়ে স্টার্ট করতে একটু লেট হয়ে গেল।"

ফেকলুদা কাটান দেন।

ফেকলুদার শ্বশুরবাড়ির সবাই গাড়িখানা ঘিরে দেখতে থাকে। ফেকলুদার মেজো শ্যালক বেচুদা একবার মন্তব্য ছুঁড়লেন, "পুরনো।"

"হুঁ, তবে বিলিতি গাড়ি। ইঞ্জিন বডি ফাসক্লাস।" ফেকলুদা গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন।

বেচুদা একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে সরে গেলেন। ভাবে বোঝা গেল যে, নেহাত ভগ্নিপতি, তাই এ-নিয়ে আর খোঁচালেন না।

"তোমরা এখন রেস্ট নাও।" ভজাদের বৈঠকখানায় রেখে ফেকলুদা বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

বৈঠকখানা ভোঁ-ভোঁ। ভজারা চারজন শুধু বোকার মতন বসে, সবারই খুব তেষ্টা পেয়েছে। বছর সাত-আটেকের একটি ছেলে যাচ্ছিল ঘর দিয়ে। ভজা তাকে বলল, "একটু খাবার জল আনতো খোকা।"

ছেলেটা টেরিয়ে দেখে জিভ ভেঙিয়ে অন্য দরজা দিয়ে দৌড়ে পালাল।

মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করে শিবু বাড়ির অন্দরে উঁকি দিয়ে এক ভদ্রলোককে ডেকে বলল, "একটু জল খাওয়াবেন ?"

খানিক বাদে একজন মাঝবয়সী কাজের লোক এক গ্লাস জল হাতে হাজির হল। ছোটন তাকে খিঁচিয়ে উঠল, "মাত্র এক গ্লাসে কী হবে ? আমরা সব্বাই খাব।"

লোকটি গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে রেখে রাগী মুখে চলে গেল।

অল্পক্ষণ বাদে ফের তাঁর আগমন, এবং এক-জগ জল টেবিলে নামিয়ে রেখেই প্রস্থান।

খানিকক্ষণ বাদে সেই কাজের লোকটি আবার এল। তার হাতে ট্রে'তে চারটি কাচের প্লেট। প্রত্যেক প্লেটে মাত্র দুটি করে অ্যারারুট বিস্কুট এবং একটি করে পায়রার ডিমের সাইজের রসগোল্লা। সঙ্গে জাঁদরেল এক প্রৌঢ় বিধবা মহিলা। মহিলা পরিচয় দিলেন, "আমি হলুম পিসিমা।"

ট্রে রাখা হল ভজাদের সামনে। পিসিমা বললেন, "খাও, খাও, লজ্জা

কোরো না।"

আধ মিনিটেই প্লেট খালি। দু-দু'বার গাড়ি ঠেলতে কম মেহনত হয়নি। কিন্তু খিদে মেটা তো দূরে থকে, বরং আরও চাগিয়ে উঠল। একমুঠো ধুনো ছুঁড়লে আগুনের শিখা যেমন লকলকিয়ে ওঠে।

পিসিমা ইনিয়েবিনিয়ে বলতে থাকেন, "তোমাদের বাবা মোটর চড়ার খুব শখ, তাই না? হ্যাঁ, তা তো হবেই' ছেলেমানুষ! আমাদের অম্বুজ আবার পাড়ার ছেলেপিলেদের বড্ড ভালবাসে। তোমরা ধরেছিলে, তাই না-করতে পারেনি। তবে বাপু, আমরা খুব আশা করেছিলুম, জয়ি আসবে। জয়ির মেয়ে আসবে। ওদের আর এবার আসা হল না।"

ভজা বলল, "কেন?"

পিসিমা বললেন, "তোমরা এলে কিন, তাই। জয়ি আবার গাড়িতে ঘেঁষা-ঘেষি করে চাপতে পারে না। তা জামাই বলেছে। ফের আসবে গাড়িতে মেয়ে-বউকে নিয়ে, যত শিগগির পারে।"

ভজা যেন কিছু বলতে মুখ তুলে ফের ঘাড় নামিয়ে নিল।

পিসিমা বললেন, "পরের বার তোমরা কিন্তু বাবা ফের গাড়ি চড়ার আবদার ধোরো না।"

কাজের লোকটি ফোড়ন কাটে, "সেজদি অনেকদিন আসেনি।"

পিসিমা বললেন, "যা বলেছিস রামু। আহা, এবার খুব আশা করে-ছিলুম গো।"

অন্তুর ভারী রাগ হল। কেন ভজা তাদের জুটিয়ে আনল। কিন্তু ফেকলুদার স্ত্রী জয়া-বউদির না-আসার কারণ তো শুনেছে অন্য!

পিসিমা ও রামু চলে যাবার পর ভজা বলল, "চ, একটু বেড়িয়ে আসি।"

পথে বেরিয়েই ছোটন বলল, এই ভজা, তুই আমাদের সেধে সেধে আনলি কেন?। এরা আমাদের হ্যাংলা ভাবছে। যেন কখনও মোটর চড়িনি।"

এই নিয়ে অন্তু আর শিবুও ভজার উপরে রেগে যায়। ভজার মুখ থমথমে। তবে জবাব দেয় না পিসিমার বাক্যবাণে বেশ চটেছে মনে হল।

ঘণ্টাখানেক এদিক-সেদিক ঘুরে ফেকলুদার শ্বশুরবাড়িতে ফিরতেই সেই পিসিমা ঝঙ্কার দিলেন, "ইশ, বেলা বারোটা বাজে, খাবে কখন? তোমাদের দেরি দেখে অম্বুজ নেয়ে নিয়ে খেতে বসে গেছে। চান করে এসেছ তো, না নাইবে এখন? গামছা-টামছা আছে সঙ্গে?"

ভজা বলল, "হ্যাঁ, আমরা চান করে এসেছি। খেতে দিন।" যদিও স্নান

করে বেরোয়নি ভজারা, কিন্তু এরা এত ব্যাস্ত হচ্ছে দেখে আর দেরি করতে চাইল না। হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসে গেল বৈঠকখানায় পরপর পাতা আসনে। রামু এল খাবার নিয়ে।

স্রেফ ডাল, ভাত, ডাঁটা-চচ্চড়ি, বেগুনভাজা, কাটা-ভর্তি চারাপোনার ঝোল আর তেঁতুলের টক। নো দই-মিষ্টি। এর নামকি নেমন্তন্ন! এমনকী, বিঘত-খানেকের চেয়ে খাটো মাছ, একটার বেশি দু'খানা দিল না। বার-দুই কেবল রামু বলল, "ভাত চাই? ডাল আর দেব?"

ভজাদের খাওয়া শুরু হতেই পিসিমা সরে পড়েছিলেন। তদারকিতে ছিল শুধু রামু। গোমড়া মুখে ঘাড় গুঁজে ঝটপট খাওয়া শেষ করল চারজন।

খাওয়ার পর মুখ-হাত ধুয়ে বৈঠকখানায় এসে বসেছে ভজারা, এমন সময় ফেলুদার আবির্ভাব! পরনে গেঞ্জি ও লুঙ্গি। পান চিবোতে-চিবোতে ঘরে ঢুকে বললেন, "কী, খাওয়া শেষ? বেশ বেশ। এবার একটুখানি জিরিয়ে নাও, তারপর রওনা হব।" ফেকলুদা ফের অন্দরমহলে অদৃশ্য হলেন। ভজা কটমট করে তাঁর যাওয়া দেখল।

ফেকলুদা চলে যেতেই ভজা চাপা ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, "লায়ার, মিথ্যুক। এখানে বলেছে, আমরা সেধে এসেছি। আরে, উনিই তো আমায় ধরাধরি করলেন আর-ক'জনকে সঙ্গে জোটতো। যদি পথে গাড়ি ঠেলতে হয়, তাই। গাড়ি মোটেই সারায়নি। ওই ভয়েই তো জয়া-বউদি সঙ্গে আসেননি। পথে গাড়ি ঠেলে ঠেলে স্টার্ট করাতে হলে বেইজ্জতি হয়, সেইজন্য। আর এখানে কিনা আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন। বলেছিলেন, দারুণ খাওয়াবে। সেটাও গুল। দেখলি তো খ্যাঁটের ছিরি। একবার খবর নিল না অবধি আমাদের। ভাবলাম পড়ার লোক, নতুন গাড়ি কিনে শশুরবাড়িতে দেখাতে চায়। একা যেতে সাহস হচ্ছে না একটু হেল্প দিই। এই তার রিটার্ন! রোসো, দেখাচ্ছি মজা।"

গোলগাল ফর্সা ভজা, দেখতে নিতান্ত গোবেচারা। কিন্তু 'ও যে কী চিজ, পাড়ার প্রায় সবাই জানে। অন্তু ছোটন শিবু বুঝল, ফেকলুদার কপালে দুঃখ আছে।

দুপুর তিনটে নাগাদ রওনা দিলেন ফেকলুদা। ভাগ্য বটে। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেকলুদার মেজাজি গাড়ি নিজে-নিজেই দিব্যি স্টার্ট নিল। ফেকলুদা খুশিতে গদগদ। পাশে-বসা ভজাকে বললেন, "গাড়িটার বুদ্ধি আছে হে। শ্বশুরবাড়িতে আমার প্রেস্টিজ রেখেচে"

মোটর মিনিট-পনেরো চলেছে। ফেকলুদা গুনগুন কার গান গাইছেন ফুর্তিতে। হঠাৎ ভজা বলল, "এক কাপ চা খেয়ে নেবেন নাকি ফেকলুদা ?"

"চা ? তা মন্দ নয়।" চা-পানে কখনও আপত্তি নেই ফেকলুদার।

পথের ধারে এক দোকানে চা খেলেন ফেকলুদা। ভজা বলল, "আমরা এখন চা খাব না। একটু আগে ভাত খেয়েচি। পরে শ্যামবাজারে খাব।"

গাড়িতে উঠে বারকয়েক স্টার্ট মারলেন ফেকলুদা ঘোঁত-ঘোঁত করল গাড়ি, কিন্তু প্রাণ খুলে ডাক ছাড়ল না ইঞ্জিন! অর্থাৎ সেই পুরনো রোগ আবার ফিরে এসেছে। ফেকলুদা বললেন, "ওহে, ঠেলতে হবে।"

ভজারা চারজন যথারীতি গাড়ির পিছন দিকে গেল! ভজা বলল, "একটু অপেক্ষা করুন, ফুলপ্যান্টটা খানিক গুটিয়ে নিই।"

ভজা কিন্তু মোটেই প্যান্ট গুটোবার উদ্যোগ দেখাল না। তার দৃষ্টি আরও পেছনে। জায়গাটার কাছেই একটা বাস-স্টপ। একটা বাসকে আসতে দেখে ভজা হাত তুলে তাকে থামতে ইঙ্গিত করে বন্ধুদের ধাক্কা দিয়ে বলল, "আয়, কুইক।" বলেই সে ছুটল।

ব্যাপারটা কী ঘটেছে, বোঝার চেষ্টা না-করেই বাকি তিনজন ভজার পিছু-পিছু দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠে পড়ল!

ফেকলুদা স্টিয়ারিং হুইল ধরে রেডি। এক্ষুনি ঠেলা খেয়ে গড়াবে তাঁর গাড়ি। শ্যামবাজারগামী একটা বাস তাঁর গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। বাসের দরজায় হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে ভজা ফেকলুদার দিকে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, "টা টা। বাই বাই।"

ফেকলুদা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

পূর্ণেন্দু পত্রী

ভজন, ভোজন, ভজু

জামসেদপুর থেকে চিঠি এল বড় মেয়ে পিংকি ওরফে পুটুর। বাড়ির বড় মেয়ে।

শ্রীচরণেষু, মা,

তোমার জামাইয়ের শরীর খারাপ। এবারে তাই পুজোর ছুটিতে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার বদলে আমরা কলকাতাতেই যাবো স্থির করেছি! তাতে এককাজে দুকাজ হবে। অনেকদিন বাদে তোমাদের সঙ্গে পুজো দেখা আর ওঁর ডাক্তার দেখানো। তা ছাড়া ভজনকেও ডাক্তার দেখানোর দরকার আছে। ওর স্বভাব-চরিত্রির দিনকে-দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। আশা করি তোমরা সবাই কুশলে আছো।

প্রণামান্তে,

ইতি,

চিঠি পড়ে সারা বাড়িতে হৈ হৈ।

আদালতে আজ বড় কর্তার খুব বড় রকমের মামলা। তিনি সকাল থেকেই ব্যস্ত নথি-পত্র গোছাতে। অতি ব্যস্ততায় একটু আগে তিনি নথি-পত্রের মধ্যে

নিজের নস্যির কৌটোটাকে বেঁধে ফেলেছিলেন। আড়াই ঘন্টা খুঁজেও যখন পাচ্ছিলেন না, তখন প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন তিনি। কেননা নাকে নস্যি না নিলে তাঁর মগজে বুদ্ধির মার-প্যাঁচ আসে না। মগজটাকে ঝাড়পোছ করার জন্যেই নস্যি। যে মামলায় আজ তাঁর রাজার মতো জেতার কথা, সেখানে কি হরিজনের মতো হারবেন না কি? রাগে হাতীর ভঙ্গীতে নিজের ঘরে থপ্ থাপ পায়চারী করছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত রাগটা যখন বাড়তে বাড়তে ব্রহ্মতালুতে উঠে গেল তখন নথি-পত্রের লাল ফিতে বাঁধা ফাইলটাকে টেবিল থেকে ছুঁড়ে দিলেন জানলার দিকে। সেটা জানলার গ্রীলে না লেগে লাগল বই-ঠাসা কাঁচের আলমারীতে। আর তখনই খুটুস-খুট শব্দে নস্যির চারচৌকো রুপোর কৌটোটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। এক টিপ নস্যি নিয়ে এলোমেলো নথি-পত্রকে পুনরায় গোচাচ্ছেন যখন, সৌদামিনী পোষ্টকার্ডখানা হাতে নিয়ে হরিনাথের চেম্বারে ঢুকলেন?

—পুঁটু চিঠি দিয়েছে। দেখেছো?

—পুঁটুর চিঠি তোমার পেটে থাকলে দেখবো কি করে?

স্বামীর গুরুগম্ভীর প্রশ্নে প্রথমটা থতোমতো খেয়ে যান। চিঠিটা যে কার পেটে ছিল মনে করতে সময় লাগে তাঁর। মনে পড়লে তিনি ঝংকার দিয়ে ওঠেন।

—তোমার কি মাথা খারাপ নাকি? চিঠি কেউ আবার পেটে লুকিয়ে রাখে? চিঠি কি গলদা চিংড়ী না ইলিশ মাছ? এই তো এইমাত্র দিয়ে গেল নগেন ধোবা।'

—নগেন ধোবা আবার পিয়নের চাকরী পেল কবে?

—পিওন হতে যাবে কেন সে? চিঠিটা এসেছিল গত সপ্তাহে। দেবু সেটা পকেটে রেখে আমাদের দিতে ভুলে গিয়েছিল। কাল রোববারে নগেন জামা-কাপড় নিয়ে গেল। দেবুর জামাটা কাচতে গিয়ে পকেট ঘেঁটে পেয়ে গেল বলেই একটু আগে দিয়ে গেল।

—অ। দেখি।

সৌদামিনীর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে, এক নিশ্বাসে পড়ে, আবার সৌদামিনির হাতে ফেরত দেওয়ার সময় হরিনাথের প্রশ্ন।

—ভজনটি আবার কে?

সৌদামিনী, পাছে হারিয়ে যায়, তাই পোষ্টকার্ড খানাকে চার ভাঁজ করে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে

—ও মা, ভজনকে চিনতে পারলে না ? ভজন তো পুঁটুর মেজ ছেলের নাম।

হরিনাথের গলায় মেঘ গর্জন।

—তুমি কি কচি ছেলে ভেবেছো নাকি আমাকে ? সংসারের সাতে-পাঁচে থাকি না বলে, ভেবেছো কিছুই খবর রাখি না, আমি, হরিনাথ ব্যারিস্টার, আমার সামনে দুটো কান, পিছনে দুটো কান। সামনে দুটো চোখ, পিছনে দুটো চোখ। আমার একটা ঘাড়ে দুটো মাথা। আমাকে ছেলে ভোলাতে চেয়ো না তো।

সৌদামিনীর গলায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

—সে তো হবেই। তুমি বাড়ির মাথা। তোমাকে কতদিকে মাথা ঘামাতে হয়। একটা মাথা হলে চলবেই বা কেন ? কিন্তু পুঁটুর ছেলে....

—আবার বলে পুঁটুর ছেলে। ভজন মোটেই পুঁটুর ছেলে নয়। পুঁটুর বড় ছেলের ডাক নাম ঝড়ু। বৈশাখে হয়েছিল বলে। ভালো নাম সর্বাঙ্গসুন্দর। মেজো ছেলের ডাক নাম খরু। খরার বছরে হয়েছিল বলে। ভালো নাম অনিন্দসুন্দর। ছোট ছেলের নাম সরু। জন্ম থেকে পাকাটির মতো রোগা বলে! ভালো নাম চিরসুন্দর। এই তো! এর মধ্যে ভজন আসছে কোত্থেকে ?

—ওমা, তাইতো! তাহলে ভজন আবার কে জুটল ?

—বাড়ির কম বয়সী কোন চাকর-বাকর হবে হয়তো!

সৌদামিনীর,গলায় মাছের কাঁটা ঢোকে যেন একটা। ভজন কে জানতে না পারলে তাঁর গলা থেকে সে কাঁটা নামবে না। হরিনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা চলে যান বড়বৌমার ঘরে, দোতলায়।

—বড়বৌমা। ভজন কে তুমি জানো কিছু ?

বড়বৌমা তখন খলে মকরধ্বজ মাড়ছিল। মকরধ্বজে তিন ফোঁটা মধু ঢেলে।

—ভজন ? ভজন আমি বিয়ের আগে পর্যন্ত জানতুম। মীরা বাঈ-এর ভজন। কিন্তু এতগুলো বছর তো আর গাওয়া-গাওয়ি নেই। এখন কি আর গাইতে পারবো মা ?

—না বাছা, আমি ভজন গানের কথা জিজ্ঞেস করতে আসি নি। ভজন যে এক ধরণের গান সে কি আর তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে নাকি ? তুমি আবার কবে ভজন শুনছো ? আমরা শুনেছি বটে ছেলেবেলায়। বেনারস থেকে

আসতো রুকাকনি নামে এক বাঈজী, কী পরমাসুন্দরী দেখতে। যেন পটের ছবিটি। গান হতো জলসাঘরে, মাঝরাতের পর। সে ঘরে আমাদের ঢোকা বারণ। আমরা চুরি করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনতাম।

—আপনি ভুল করছেন মা। আপনি যা শুনেছেন সে তাহলে গজল বা ঠুংরী। বাঈজীরা কখনো ভজন গায়?

—বা, তোমার তো দেখছি গান-বাজনায় খুব জ্ঞান? বাঈজীরা ভজন গায় না বুঝি? তুমি তো নিজেই মীরা বাঈ-এর ভজন বললে একটু আগে।

—বাই হলে কি বাঈজী হয় নাকি?

তুমি থামো মা। চুপ করো। সাতসকালে আর অতো লেকচার মেরো নি। আমি জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম পুঁটুর চিঠির ভজনের কথা।

সৌদামিনী দোতলা থেকে তিনতলায় উঠে মেজ বৌ সুমিতার ঘরের কড়া নাড়েন। ভজনের নাম শুনেই সুমিতার মুখ খুশিতে কাটা তরমুজের ফালির মত রাঙা হয়ে যায়।

—ওমা! ভজন এসেছে বুঝি? কোথায়? নীচে বসে আছে? আমি যাই, উপরে ডেকে আনি।

সৌদামিনী কিছু বলার আগেই সুমিতা মাছের গন্ধ পাওয়া বেড়ালের মতো তরতরিয়ে নেমে যায় নীচে। সৌদামিনীকেও বাধ্য হয়ে নীচে নামতে হয়। নীচে নামার মুখেই তিনি দেখতে পান দোতলার করিডরের প্রান্তে রিংকি কার সংঙ্গে কথা বলছে টেলিফোনে।

—শ্যামলীকে নিয়ে ছ'জন হল। তুই যে বললি সাতজন? ওমা, আবার ভজনদাকেও ঢুকিয়েছিস পিকনিকে? না, তা বলছি না, তবে বড্ড বক্‌বক্‌ করে আর খাই-খাই বাতিক। তা ডেটটা ফিক্‌স করেছিস কিছু? আমাকে আগে জানাস। আমার মা যা রায়বাঘিনী, পিকনিক বললে একদম বেরোতে দেবে না, আমাকে বলতে হবে অন্য কিছু বানিয়ে, বুঝতে পারছিস তো....

অন্য সময় হলে সৌদামিনীর, কয়লার উনোনের মতো জ্বলে ওঠার কথা। পেটের মেয়ে টেলিফোনে অন্যের কাছে মায়ের নিন্দে করে, এরকম একটা অগ্নি-কাণ্ড হওয়ার যোগ্য ঘটনাকে নীরবে আমলকীর আচারের মতো হজম করে করে ফেলা তাঁর স্বভাবের পক্ষে অসম্ভব। তিনি ভাবছিলেন এগিয়ে গিয়ে চুলের ঝুটিটা চেপে ধরবেন রিংকির। কিন্তু সেই সময়েই দেবুর পড়ার ঘরে একটা প্রচণ্ড সোর গোলের শব্দ শুনে তাঁকে নেমে আসতে হল একতলায়। তুমুল তর্ক বেধেছে দেবুর সঙ্গে মেজকাকার।

—না, তুমি হেরেছ। দশ টাকা দিতেই হবে।

—ফের চ্যাঁচাচ্ছিস তুই? আমি তোকে কি বলেছিলুম রে গাধা? মিথ্যে কথা বলে আমার কাছে পার পাবি না।

সব লেখা আছে আমার ডাইরীতে, সাল তারিখ সহ। বল, কি বলেছিলাম?

—তুমি বলেছিলে ভজনলাল কোনদিনই টেস্টে চান্স পাবে না।

—নো, নেভার। একথা আমি বলতেই পারি না। আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে, আমি বলেছিলাম, ইংল্ড সফরে ভজনলালের ডাক পড়বে না। আমার স্মৃতিশক্তি পলতা পাতার মত নরম হতে পারে, কিন্তু আমার ডাইরী? সে তো বাবা চিত্র গুপ্তের খাতা। ভুলচুক ঢুকবে এমন ছিদ্র নেই কোথাও।

সৌদামিনী ওদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়ান।

—কি চেঁচামিচি লাগিয়েছ কাকা-ভাইপোয় ভজনলালকে নিয়ে। সে ভজনলাল আবার কোথাকার কে জানিনে বাবু। ইদিকে তো আমি জড়িয়ে পড়েছি আর এক ভজনকে নিয়ে।

মেজকাকা ঘুরে তাকান সৌদামিনীর দিকে।

—তুমি আবার আর এক ভজন জোগাড় করলে কোথ্যেকে?

—এই দেখো।

আঁচলের গেরো খুলে চার ভাঁজ করা চিঠিটা তিনি তুলে দেন দেওয়রের হাতে। চিঠিটা পড়ে মেজকাকার মুখ যেন রাঙা আপেল

—বাঃ, এতো খুব শুভসংবাদ। কতদিন দেখিনি পুঁটুকে। তাহলে পুজোয় এবার জমজমাট আমাদের বাড়ি।

—সে না হয় হল, কিন্তু ভজনের কথাটা যে লিখেছে, ভজনটা কে?

—ভজন? হ্যাঁ সত্যিই ভজনটা কে বলতো?

—আমার যেন একবার মনে হয়েছিল ভজন বুঝি পুঁটুর মেজ ছেলের নাম। শুনে তো তোমার দাদা বললেন, তার ডাক নাম খরু। ভালো নাম অনিন্দসুন্দর। সৌদামিনীর কথা শেষ হতেই না হতেই মেজকাকার মুখে শাওয়ারের ফিন্‌কি—জলের মতো হাসি।

—কি হল, হাসছ কেন?

—এসব কথা তোমায় কে বলেছে?

—কোন কথা?

—পুঁটুর মেজ ছেলের নাম খরু।

—কেন? তোমার দাদা।

—দাদার মাথাটা একদম গেছে। স্মৃতিশক্তি লোপাট। কি করে যে ব্যারিস্টারী করে আল্লা জানে!

—কেন গা?

—আরে দাদা যা বলেছে, সে তো তোমার মেজ মেয়ের সেজ ছেলের নাম। পুঁটুর হবে কেন? পুঁটুর বড় ছেলে জন্মেছিল কার্তিক মাসে। তাই তার নাম রাখা হয়েছিল কাতু। ভালো নাম সৌম্যকান্তি। মেজ ছেলে জন্মেছিল বৈশাখে। কিন্তু পুঁটুর স্বামী তখন পাতিয়ালায় বদলী হয়ে গেছিল বলে ডাক নাম রাখা হয়েছিল পাতু। ভাল নাম পীযূষকান্তি। আর ছোট ছেলের কি নাম রাখা হয়েছিল আমার ডাইরীতে লেখা নেই। কেননা সে তো প্রায় জন্মেই মারা গেল। আচ্ছা চিঠিখানা আমার কাছে থাক। ডাইরীটা ঘেঁটে দেখবো।

এই সময়েই কুংফু এসে দাঁড়ায় সেখানে।

—মেজবাবু কে একজন লোক এয়েছেন। জিজ্ঞেস করনু, কি নাম আপনার? তিনি বললে, ভজন সিং। বাবুকে গিয়ে বল, যে পুঁথি তিনি চেয়েছিলেন, সেই পুঁথি নিয়ে এসেছি।

—ওঃ পুঁথি? বুঝেছি। ও তাহলে খুঁজছে টেবুকে। যা মেজবাবুকে খবর দে।

টেবু মানে রতিকান্ত। বাড়ির মেজ ছেলে। ইতিহাসের অধ্যাপক, এখন গবেষনা করছে রাজস্থানের পুঁথির উপর।

বিকেলে পাথুরেঘাটা থেকে বেড়াতে আসে হরিনাথের মামাতো ভায়ের বাড়ির লোকজন। গল্পগাছার মধ্যে সৌদামিনী পুঁটুর চিঠির প্রসঙ্গ তোলেন। গড়াতে গড়াতে প্রসঙ্গটা পেঁছয় ভজনে! মামাতো ভাইয়ের বৌ কালোশশী জিজ্ঞেস করে।

—ভজন আবার কে?

সৌদামিনীর ঠোঁট এমনিতেই পানে রাঙা। মুখে আরও একটা পান পুরে, গাল ফুলিয়ে, জর্দার কৌটো খুলতে খুলতে।

—ভাগ্য ভালো হলে দিদি এই রকমই হয়। আমাদের কপালে নেই তো হবে কি? পুঁটু আমাদের ভজন বলে একটি বিহারী ছেলে পেয়েছে, সে যে কী ছেলে কী বলবো তোমাকে। সোনার টুকরো যেন। পুঁটু মুখ থেকে কথা খসাতে না খসাতেই দৌড়ে কাজ করে দিচ্ছে। যেমন ভদ্র স্বভাব তেমনি কাজের ছেলে।

—তাহলে স্বভাব-চরিত্রর খারাপ হয়ে যাওয়ার কথাটা লিখেছে কেন?

—ঐ তো, পুঁটুর তো ঐ রকমই স্বভাব। একটুতেই নেতিয়ে পড়ে। হয়তো

চুরি-চামারি করেছে দু-চার পয়সা। পুটু আমাদের ভয়ে কাঁপবে, এ ছেলে না ডাকাত হয়। এই কথোপকথনের মাঝখানেই হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হন মেজকত্তা। হাতে ডাইরী।

—বৌদি এখানে আছো? এই যে পেয়ে গেছি তোমার ভজনকে। ৩রা অক্টোবর ১৯৮১। পুটুর ২১শে সেপ্টেম্বরে লেখা চিঠির জবাবে আমি লিখেছিলাম—

স্নেহের পুটুরানী,

তোমার ২১ তারিখে চিঠি পাইয়া পরম শান্তিলাভ করিয়াছি। তুমি একটি বেড়াল পুষিয়াছ শুনিয়া অন্তরে আরও আনন্দ পাইলাম। 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'—এই মহাবাণী তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। তুমি বেড়ালটার জন্য একটি নাম চাহিয়াছ। অনেক ভাবিয়া আমি একটি নাম স্থির করিয়াছি। বেড়াল মাত্রই লোভী? শত খাওয়াইলেও উহাদের ক্ষুৎ-পিপাসা মেটে না। সুতরাং উহার নাম রাখিতে পারো ভোজন। আমি মনে করি পৃথিবীর সমস্ত বেড়ালেরই ঐ নামকরণ হওয়া উচিত। ভোজন নামটি আমার সেই কারণে পছন্দ। অবশ্য ডাকিতে ডাকিতে আদরের চোটে তাহা কোন একসময় ভজন বা ভজুতেই রূপান্তরিত হইতে পারে। তোমাদের মতামত জানাইলে খুশি হইব।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

চোরে ডাকাতে

সে আমলে আমাদের পরগনায় বিখ্যাত চোর ছিল সিধু। তাঁর হাত খুব সাফ ছিল, মাথা ছিল ঠাণ্ডা, আর তুখোর বুদ্ধি। দিনের বেলা সিধু গৃহস্থের মতো চালচলন বজায় রাখত, আমাদের বাড়িতেও বেড়াতে টেড়াতে আসত সে। আর পাঁচজনের মতোই ঠাকুমা তাকেও ফল-টল খাওয়াতেন, মুড়ি মেখে দিতেন। কেবল সে চলে যাওয়ার পর ঠাকুরমা গেলাশ বাটি গুনে দেখতেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা। সিধু সব বাড়িতে যেত খবর করতে, কার বাড়িতে নতুন লোক এল, কী নতুন কাপড়চোপড় এল দোল, দুর্গোৎসবে, কোন বাড়িতে টাকা পয়সার আমদানি হচ্ছে, ইত্যাদি! খবর বুঝে রাত-বিরেতে হানা দিত সেই বাড়িতে। এমন সব মন্ত্র জানা ছিল তার যে, সেই মন্ত্রের জোরে বাড়ির সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোতো, সিধু হাসতে হাসতে চুরি করে নিয়ে যেত সব। এমন কী যাওয়ার আগে গেরস্তের ঘরে বসে দু দণ্ড জিরিয়ে তামাক টামাক খেয়ে যেত। আমরা ছেলেবেলায় যখন তাকে দেখেছি তখন সে বেশ বুড়ো। পরনে ফরাস-ডাঙার ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবি, পায়ে নিউকাট, মুখে পান, আর গলায় গান। বুড়ো বয়সেও বেশ শৌখিন ছিল সে। চার আঙুলে চারটে করে আংটি পরত। বাজার করতে গিয়ে দরাদরি করত না। চুরি করে প্রচুর পয়সা করেছিল সে।

বাড়িতে দশ-বারোটা গরু। সাত আটজন ঝি-চাকর, জুড়ি-গাড়ি সবই ছিল তার। বুড়ো বয়সে তার ভীমরতি হয়েছিল খানিকটা। তখন তার চোখে ছানি আসছে, বাত-ব্যাধিতেও কষ্ট পাচ্ছে। খুব দরকার না পড়লে চুরি করতে যেত না। এদিকে তার ছোটো মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়েছে। একটা ভাল সম্বন্ধও পেয়ে গেল। মেয়ের বিয়ে, তার খরচ কম নয়। তার বৌ তখন তাকে প্রায়ই খোঁচাত, "মেয়ের বিয়ে আষাঢ়ে, তোমার তো গরজই নেই দেখছি, অত বড় ব্যাপার, তার খরচাপাতি আসবে কোত্থেকে? রাতের দিকে একটু-আধটু বেরোলে তো হয়।" সিধু তখন তার কাঁকালের ব্যথার কথা বলত, চোখের ছানির কথা বলত, কিন্তু তার বৌ সে-সব শুনত না। শোনা যায়, বুড়ো বয়সে সিধুর কিছু ভূতের ভয়ও হয়েছিল। নিশুত রাতে বেরোতে সাহস পেত না।

আমাদের পরগনায় আর একজন বিখ্যাত লোক ছিল। তার নাম হালিম। লোকে বলত হালুম মিঞা। তা হালিম ছিল সাঙ্ঘাতিক ডাকাত। যেমন তার বিরাট চেহারা, তেমনি তার সাহস। যে বাড়িতে ডাকাতি করবে, সে-বাড়িতে সাতদিন আগে গিয়ে তার সাকরেদ চিঠি দিয়ে আসত যে, অমুক দিন হালিম সে-বাড়িতে ডাকাতি করতে আসবে, পূর্ববঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে দারোগা পুলিশ খুব বেশী ছিল না। তাছাড়া খালবিল জঙ্গলের দেশ বলে অধিকাংশ জায়গাই ছিল দুর্গম। সে-সব জায়গায় চোর-ডাকাতদের ভারী সুবিধে। হালিম বা হালুম মিঞাকে তাই কেউ কখনো জব্দ করতে পারেনি। সে ছিল দারুণ লাঠিয়াল, অসম্ভব সাহসী। দরকার না পড়লে সে খুন-টুন করত না। জমিদার বা ধনীরা সাধারণত হালিম মিঞা ডাকাতি করতে এলে খাতির-টাতির করত। শোনা যায়, হালিম যে-বাড়িতে ডাকাতি করতে যেত, সে-বাড়ি আগে থেকেই বিয়েবাড়ির মতো সাজানো হত, রোশনাই দেওয়া হত, ভাল খাবার দাবারের বন্দোবস্ত থাকত। হালিম উপস্থিত হলে বাড়ির মালিক হাতজোড় করে 'আসুন বসুন' করত। হালিম বিনা বাধায় ডাকাতি করে চলে আসত, কিংবা ঠিক ডাকাতি তাকে করতে হত না, বাড়ির লোকেরা তাকে সিন্দুকের চাবি-টাবি খুলে সব গুনেগেঁথে দিয়ে দিত। কিন্তু সকলের তো দিন সমান যায় না। আমাদের ছেলেবয়সে সেই কিংবদন্তীর ডাকাত হালিমও বুড়ো হয়েছে। গোরস্থানের কাছে তার বেশ বড় বাড়ি। তারও দাসী, চাকর, ধানের মরাই, জোত-জমি-গরু সবই আছে। আমরা হালিমকে দেখতাম কানে আতরের তুলো গুঁজে, চোখে সুর্মা দিয়ে, চমৎকার চেক-কাটা সিল্কের লুঙ্গি আর মখমলের পাঞ্জাবি পরে জমিদারের পুকুরে ছিপে মাছ মারছে। খুব গম্ভীর ছিল সে,

চোখ দুখানা সবসময়ে লাল টকটকে। ডাকাতি করা তখন ছেড়েই দিয়েছে, তবে শিক্ষানবিশ ডাকাতরা তার কাছে তালিম নিতে আসত।

সিধুর কথা যা বলছিলাম। বৌয়ের তাড়নায় অবশেষে সে একদিন রাতে চুরি করতে বেরোলো। চোখের ছানির জন্য রাস্তাঘাট ভাল ঠাহর হয় না, তাই সঙ্গে হ্যারিকেন নিল। একা যেতে ভূতের ভয়, তাই একজন চাকরকেও ডেকে নিল সঙ্গে। রাস্তায় সাপ-খোপের গায়ে পা পড়তে পারে ভেবে হাততালি দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল। আর ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য তারস্বরে রামনাম করতে লাগল। সেই হাততালি আর রামনামের চোটে এত বিকট শব্দ হচ্ছিল যে, রাস্তার দুপাশের বাড়িঘরে লোকজনের ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। তারা সব উঁকি মেরে দেখছে, ব্যাপারখানা কী! অনেকেরই ধারণা হল সিধু চোর, ধার্মিক হয়ে গেছে। তাই রাত থাকতে উঠে ঠাকুরের নাম নিতে নিতে প্রাতঃস্নান করতে যাচ্ছে নদীতে। এদিকে সিধুর হল বিপদ যে-বাড়িতেই ঢুকতে যায় সে-বাড়িতেই দেখে গৃহস্থ সজাগ রয়েছে। ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেল সে। কত ঘুমপাড়ানী মন্ত্র পাঠ করল, কিন্তু বুড়ো বয়সে মন্ত্রের জোরও কমে এসেছে, তেমন কাজ হয় না।

ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গোরস্থানের কাছ-বরাবর এসে এক গাছতলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল সিধু। খুব ঠাহর করে সমুখপানে দেখে বলল, "ঐ মস্ত বাড়ি, ওটা কার রে?"

চাকর উত্তর দিল, "ও হালুম মিঞার বাড়ি।"

"বটে বটে!" বলে খুব খুশির ভাব দেখাল সিধু, "তা হালিম দুপয়সা করেছে বটে। এতকাল তো খেয়াল হয়নি!"

এই বলে সিধু সিঁদকাঠি বের করল।

পরদিন গঞ্জে হৈ-চৈ পড়ে গেল। হালুম মিঞার বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে। সকালে হালিমের বৌ পা ছড়িয়ে পাড়া জানান দিয়ে কাঁদতে বসেছে— "ওগো আমার কী হল গো? আমার সব চেঁছে পুঁছে নিয়ে গেছে গো। বলি ও বুড়ো হালিম, তোর শরম নেই? যার দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত তার বাড়িতে চুরি? বলি ও মুখপোড়া হালিমবুড়ো, সাতসকালে গ্যাঁজা টানতে বসেছিস। কচু গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ফাঁসি যা থুথু ফেলে তাতে ডুবে মর...."

দাওয়ায় বসে গাঁজা খেতে খেতে হালিম কেবল রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে তার বিবিকে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ কর, চুপ কর বাঁদী। যে ব্যাটা চুরি করেছে তার গর্দানের জিম্মা আমার। দেখিস।"

তা শুনে বিবি আরো ডুকরে কেঁদে ওঠে।

হালিম দুটো কাজ করল। সিধুর নামে তিন ক্রোশ দূরের থানায় গিয়ে একটা নালিশ ঠুকে দিয়ে এল, আর সিধুর মেয়ের বিয়ের ঠিক সাত দিন আগে একটা চিঠি পাঠাল তার কাছে, তোমার কন্যার বিবাহের রাত্রে আমি সদলবলে উপস্থিত হইতেছি। আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিও...." ইত্যাদি।

চিঠি পেয়ে সিধু বলল, "ফুঃ"।

তারপর সেও গিয়ে তিন ক্রোশ দূরের থানায় দারোগাবাবুকে মুর্গী আর মাছ ভেট দিয়ে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করে এসে দাওয়ায় বসে ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে তামাক খেতে লাগল।

সিধুর মেয়ের বিয়েতে আমাদেরও নেমন্তন্ন ছিল, ছোটোকাকা সমেত আমরা সব ঝেঁটিয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, হালিম মিঞা ডাকাতি করতে আসবে শুনে যাদের নেমন্তন্ন হয়নি তারাও সব এসেছে গঞ্জ সাফ্ করে। বিয়েবাড়ি গিসগিস করছে লোকে। দারোগাবাবুও এসে গেছেন। সিধু তাঁকে বিবাহ-বাসরের মাঝখানে বরাসনে বসিয়ে দিয়েছে আর বর তার পাশে একটা মোড়ায় বসে নিজের হাতে হাতপাখার বাতাস খেতে খেতে ঘামছে।

তখনকার নিমন্ত্রণে চার পাঁচ রকমের ডাল খাওয়ান হত, তারপর মাছ, মাংস, দৈ, মিষ্টি বা পায়েস দেওয়া হত। আমরা সবে তিন নম্বর ডাল খেয়ে চার নম্বর ডালের জন্য তৈরী হচ্ছি এমন সময়ে উত্তরের মাঠ থেকে "রে রে" চিৎকার উঠল আর মশাল দেখা গেল। পাত ছেড়ে আমরা সব ডাকাতি দেখতে দৌড়ে গেলাম।

কী করুণ দৃশ্য! ষাট সত্তরজন সাকরেদ নিয়ে হালিম এসে গেছে। সকলের হাতেই বিশাল লাঠি, বল্লম, দা, টাঙ্গি। কপালে সিঁদুরের টিপ। খালি গা, মালকোঁচা করে ধুতি পরা। কিন্তু সব কজনই বুড়োসুড়ো মানুষ। এতদূর জোর পায়ে এসে আর হাল্লা-চিল্লা করে সকলেরই দম ফুরিয়ে গেছে। হালিমের হাঁপের টান উঠেছে, তাই সিধু তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসাল। কয়েকজন ডাকাত উবু হয়ে বসে কাসতে কাসতে বুকের শ্লেষ্মা তুলছে। একজনকে দেখলাম, হাতের ভারী কুড়ুলটা আর বইতে না পেরে বরযাত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের ভেরে-যাওয়া হাতটাকে ঝেড়েঝুড়ে ঠিকটাক করে নিচ্ছে।

সিধু অনেকক্ষণ হালিমের বুক মালিশ করে দেওয়ার পর হালিমের হাঁপের টানটা কমল। তখন হাতের খাঁড়াটা তুলে নিয়ে বলল, "এবার কাজের কথা হোক।"

সিধু হাতজোড় করে বলল, "তোমার মান মর্যাদা ভুলে যাইনি হে। এই নাও সিন্দুকের চাবি, দরজা টরজা সব খোলা আছে। চলে যাও ভিতর বাড়িতে।"

তো তাই হল। হুঙ্কার দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হালিম, সঙ্গে সঙ্গে তার দলবলও হুঙ্কার দিল। অবশ্য হুঙ্কারের সঙ্গে-সঙ্গেই খক্ খক্ করে কাসিও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বেশ দাপটের সঙ্গেই হালিম ভিতরে ঢুকে লুটপাট করতে লাগল। নিজের বাড়ির যেসব জিনিস চুরি গিয়েছিল সে সবই উদ্ধার করল হালিম। সিধু আগাগোড়া সঙ্গে রইল হাতজোড় করে। হালিম কোনো জিনিস নিতে ভুল করলে সিধু আবার সেটা দেখিয়ে দেয়, "ঐ কাঁসার বাটিটা নিলে না। বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে নাকি, ঐ দেয়ালঘড়িটা যে তোমার, চিনতে পারছো না?"

এইভাবে ডাকাতি নির্বিঘ্নে এবং সাফল্যের সঙ্গে শেষ হল। সারাক্ষণ দারোগাবাবু পা ছড়িয়ে বসে তামাক টানলেন। সবাই তাঁর হাফপ্যান্টের নীচে বিশাল মোটা পা, মোটা বেল্ট আর ক্রসবেল্টে বেঁধে-রাখা প্রকাণ্ড ভুঁড়ি এবং চোমড়ানো গোঁফের খুব তারিফ করতে লাগল। তিনি কাউকে গ্রাহ্য করলেন না। বর বেচারা নিজেকে বাতাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বসে ঢুলছে। বরযাত্রী সমেত সবাই ডাকাতি দেখছে ঘুরে ঘুরে।

ব্যাপারটা শেষ হলে হালিম আর সিধু এসে দারোগাবাবুর সামনে করজোড়ে দাঁড়াল। দারোগাবাবু হুঙ্কার দিলেন, "ঘটনাটা কী হল বুঝিয়ে বলু। এই বুড়োবয়সে চুরি ডাকাতি করতে যাস, একদিন মরবি।"

সিধু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "বড়বাবু, চুরি কি আর নিজের ইচ্ছায় করতে গেলাম! বৌয়ের কাছে ইজ্জৎ থাকে না, সে-ই ঠেলেঠুলে পাঠায়।"

হালিমও বলল, "আমারও ঐ কথা।"

দারোগাবাবু হাতের নল ফেলে খুব হাসলেন। তাঁর হাসিরও সবাই প্রশংসা করল।

তারপর বারান্দায় ঠাঁই করে হালিমের দলকে খেতে বসানো হল। হালিমের অবস্থা ভাল, কিন্তু তার সাকরেদরা সব হাঘরে। ডাল আর বেগুনভাজা দিয়েই তারা পাত লোপাট করতে লাগল।

সেই দেখে আমাদেরও মনে পড়ল, আমাদের পাতে এবার চার-নম্বর ডাল পড়বার কথা। আমরা সব দৌড়োদৌড়ি করে ফিরে এলাম খাওয়ার জায়গায়। এবং তারপরই গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। অর্ধেক খেয়ে উঠে গেছি, ফিরে এসে হুটপাট করে বসে পড়বার কিছুক্ষণ পরেই সবাই টের পেতে লাগলাম, পাতের গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কে কার পাতে বসেছি তার ঠিক পাচ্ছি না।

যেমন, আমার ডানপাশে ছোটোকাকা বসেছিল, বাঁয়ে সুবল। পাতে দেড়খানা বেগুনভাজা ছিল, মুড়িঘণ্টের একটা কানকো। এখন দেখছি, ছোটকাকা উল্টো-দিকের সারিতে বসে আছে, বাঁ পাশে বিপিন পণ্ডিত পাতে আধখানা মোটে বেগুনভাজা মুড়িঘণ্টের কানকোটা সেই, একটা পোট্‌কা পড়ে আছে। সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল, "এই, তুই আমার পাতে বসেছিস চোর কোথাকার....ও মশাই, আপনি তো আমার বাঁ ধারে ছিলেন. ..এ কি, আমার কুমড়োভাজা কোথায় গেল....ইত্যাদি।

তবু খাওয়াটা সেদিন খুব জমেছিল।

তারাপদ রায়

পাতালরেলের পকেটমার

কলকাতার নিউ মার্কেটের পেছন দিকের একটা চোরাগোপ্তা অন্ধকার গলি। চারপাশে যত রাজ্যের আবর্জনা, তরকারির খোসা, মুরগির পালক, ময়লা জল। তার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। রাস্তার শেষে একটা আদ্যিকালের বাড়ির একপাশের দেওয়াল ঘেঁষে লম্বা একটা টিনের চালা।

এই টিনের চালার মধ্যে একদিকে গাদা হয়ে পড়ে রয়েছে হাজার হাজার ছেঁড়া, নতুন, ভাল, খারাপ মানিব্যাগ। তারই পাশে কত রকম কলম, নামী, দামি, দিশি-বিলিতি। সেও অন্তত কয়েক হাজার। তাছাড়াও চশমার খাপ, চশমা, কাগজপত্র, কিছু ঘড়ি, আরও কত কী জিনিস ছড়ানো রয়েছে।

টিনের চালাটা বিরাট। চালাটার অন্য প্রান্তে রয়েছে একটা সাবেকি আমলের মেহগনি খাট, গদিমোড়া, তার উপরে রঙিন ঝালর-দেওয়া চাদর। ওই বিছানা হাফিজ সর্দারের। আজ সকালে ওই বিছানার ওপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে হাফিজ সর্দার। ঘরের মেঝেতে লম্বা, টানা শতরঞ্চি বিছানো ওইদিকের মানিব্যাগ, কলমের গাদা পর্যন্ত। ঘরের মেঝে ছেয়ে গেছে লোকজনে। রোগা-রোগা কালো-কালো, চেপা প্যাণ্ট আর রঙিন জামা পরা অধিকাংশ লোক। এদের নামগুলো কী রকম যেন। লাল্লু সিং, চুল্লু শেখ, কাল্লু দাস, বিল্লু মিঞা।

প্রায় সকলেরই বয়স বিশ থেকে ত্রিশের কোঠায়। দু'একজন বেশি-বয়সী বা রঙ-ফর্সা বা মোটা ব্যক্তি যে নেই তা অবশ্য নয়। তবে ঘর গিজগিজ করছে লোকে, তার মধ্যে তাদের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।

আজ সকালে এই চালাঘরে কলকাতার পকেটমারদের মিটিং বসেছে। হাফিজ এদের সর্দার। এখন যে বিছানায় বসে সভা চালাচ্ছে, সেটা তারই বিছানা। আর যে-সব মানিব্যাগ, কলম ঘরের ওপাশে পড়ে রয়েছে, সেগুলো যে পকেটমারার ফসল, সে-কথা আশা করি বুঝিয়ে বলতে হবে না।

সে যা হোক, আজকের সমস্যা গুরুতর। সেই কলকাতায় যখন ঘোড়ার ট্রাম উঠে গিয়ে বিদ্যুতের ট্রাম চালু হয়েছিল, আর তারপরে যখন প্রথম মোটরবাস এল, এই দু' সময় ছাড়া কলকাতার পকেটমারদের গত একশো বছরে এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আর হয়নি।

পকেটমাররা জেনে গেছে, এই শহরে পাতালরেল চালু হয়ে গেছে। এদের মধ্যে দু'চারজন পার্ক স্ট্রিট কিংবা ময়দান স্টেশনে সিঁড়ি দিয়ে গহ্বরের মধ্যে নেমে ব্যাপারটা কিছুটা দেখেও এসেছে।

ট্রাম-বাস, বাজার-সভা, এ-সব জায়গা সম্পর্কে এ শহরের পকেটমারদের চমৎকার অভিজ্ঞতা আছে হাতে-কলমে। কিন্তু পাতালরেল ব্যাপারটা একেবারে নতুন।

পকেটমারদের যা কিছু কেরামতি বাস-ট্রামের দরজায়। কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে, পাতালরেলের কামরার দরজা গাড়ি ছাড়া মাত্র একা-একা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর তারপরে না-থামা পর্যন্ত খুলছে না। সে খুবই দুশ্চিন্তার কথা। তাছাড়া চওড়া সিঁড়ি, অনেক আলো, কোনোটাই পকেটমারদের পক্ষে শুভসংবাদ নয়।

সবচেয়ে বড় কথা অভিজ্ঞতার অভাব! পকেটমারার কাজটা খুবই নিখুঁত হাতের ব্যাপার। যার যেখানে অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস, যে যেখানে রপ্ত করেছে, সে সেখানেই পকেট মারে। দোতলা বাসের সিঁড়িতে যে পকেট মারে, একতলা বাসের দরজায় যত লোভনীয় খদ্দেরই থাক, সে চেষ্টা করবে না। আবার একতলা বাসের দরজায় লোকটি ভুলেও কোনদিন, যতই আকর্ষণ থাক, ট্রামের দরজায় ব্যবসা করবে না। যে যেখানে যে-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, সে সেখানেই থাকবে, অন্যত্র কাজের চেষ্টা করা তার পক্ষে বিপজ্জনক।

কিন্তু এখন কোথাও গিয়ে কিছু শেখা যায় যদি তবেই রক্ষা। তা না হলে পাতালরেল পুরোপুরি চালু হলে ধনেপ্রাণে মরতে হবে। পকেটমাররা যতদূর খোঁজ নিয়ে জেনেছে, এ-দেশে কোথাও পাতালরেল নেই। সুতরাং দু'চারমাস অন্য

কোনো শহরে গিয়ে হাতে-কলমে ট্রেনিং নিয়ে আসবে, তাও হবার নয়।

কী করা যাবে এ অবস্থায়? হাফিজ সর্দারের ঘরে আজকের মিটিংয়ের আলোচ্য বিষয় এই একটাই।

সিল্কের লুঙ্গি, বিরাট গোঁফ, খালি গা, গলায় সোনার বিরাট ধুকধুকি, হাফিজ সর্দার চিন্তিত মুখে বিছানায় বসে রয়েছে আর খাটের নীচে মৃদু গুঞ্জনে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে কলকাতার অব্যর্থ পকেটমারেরা। ভাবী দিনে অনিশ্চয়তায় অস্থির সবাই।

হঠাৎ হাফিজ সর্দার মৌন ভঙ্গ করে গম্ভীর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "ভাই সব' চিন্তায় আমার রাতে ঘুম হচ্ছে না। এখন কী করবে তোমরাই ঠিক করো।"

লাল্লু সিং শেয়ালদার ট্রামে পকেট মারে। শেয়ালদায় পাতালরেল যাচ্ছে না। তাই সে একটু নিশ্চিন্ত। তার মাথাও ঠাণ্ডা? সে বলল, "কলকাতায় পুরোপুরি পাতালরেল দু'চার মাস দু'চার বছরেও হবে না। এ নিয়ে ভাবনা করে এখন কী লাভ?"

সঙ্গে-সঙ্গে চার-পাঁচজন খেঁকিয়ে উঠল, "এই, চুপ! তোমার লাইনে অসুবিধে নেই, তাই মাতব্বরি করছ, আমরা যারা চৌরঙ্গির ট্রামে-বাসে পকেট মারি, আমাদের পাতালরেলের ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

কাল্লু দাস পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের কারিগর। সে বলল, "পকেট থেকে হাত দিয়ে যখন ম্যানিব্যাগটা সরাচ্ছি, তখন যদি কামরার দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়, হাতসুদ্ধ গাড়ির দরজায় আটকে গিয়ে ঝুলতে ঝুলতে পরের স্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে, ধরা তো পড়বই, হাতটাও চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যাবে।"

নানারকম কথা-কাটাকাটি হতে লাগল। কেউ বলে, পকেট মারা ছেড়ে দিয়ে এর পর থেকে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করবে। আরেকজন বলে, কাটা ফল বেচবে। বিল্লু মিঞা বলল, তাদের বাপ-ঠাকুর্দার চুলকাটার ব্যবসা, সে'ও এখন থেকে তা-ই ধরবে।

কিছুক্ষণ আবোল-তাবোল শোনার পর হাফিজ সর্দার এক হুঙ্কারে সবাইকে থামিয়ে দিল। হিন্দি সিনেমার হিরোর মতো গর্জন করে সে বলল', "খামোস। থামো।"

হাফিজ সর্দারকে কলকাতার পকেটমাররা প্রত্যেকে বাঘের মতো ভয় পায়। তার গর্জনে মুহূর্তের মধ্যে সকলের কথাবার্তা থেমে গেল। এবার হাফিজ সর্দার তার দেশোয়ালি ভাষায় সমবেত পকেটমারদের যা বলল, তা খুবই সুচিন্তিত এবং সর্দারের যোগ্য কথা।

সর্দারের বক্তব্য হল, সামান্য এক পাতালরেলের জন্যে আর্টিস্টরা (পকেটমাররা নিজেদের আর্টিস্ট বলে থাকে) তাদের বহু কর্মের, বহু সম্মানের পেশা ত্যাগ করতে পারে না। এই পাতালরেল কলকাতার আর্টিস্টদের সামনে এক অসামান্য চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে। কলকাতার আর্টিস্টরা, যারা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত, যারা অঙ্গুলিহেলনে অসাধ্য সাধন করতে পারে, তারা কি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে না? তারা কি চোরের মতো পালিয়ে যাবে এই চ্যালেঞ্জের সামনে থেকে?

হাফিজ সর্দারের এই ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনে কলকাতার আর্টিস্টরা অর্থাৎ পকেটমারেরা নড়েচড়ে বসল। হাফিজ সর্দার বলে চলল, "ভাই সব, সামান্য পাতালরেলের ভয়ে আজ যদি আমরা পালিয়ে যাই, তাহলে তার চেয়ে আর লজ্জার কথা কী হতে পারে? ছিঁচকে চোরেরা, ছেনতাই-পার্টিরা আমাদের দুয়ো দেবে, বাটপাড়ের জগতে আর আমরা মুখ দেখাতে পারব না। আমাদের পকেটমারি পাতালরেলে চালাতেই হবে।"

হাফিজ সর্দার জানাল, সে বহু কষ্টে খবর যোগাড় করেছে যে, বিলেতে, আমেরিকায় ও অন্য যে-সব দেশে পাতালরেল আছে, সেখানেও পকেটমার আছে। আর যদি সেই সব সাহেবদের দেশের পাতালরেলে পকেটমারি চলতে পারে তো কলকাতাতেও চলবে।

এবার প্রশ্ন উঠল, সেখানে কী করে পকেটমাররা কাজ করে সেটা তো জানা দরকার। হাফিজ সর্দার বলল, "সেটা ঠিক কথা। সেই জন্যে তোমরা চাঁদা দেবে। আমি বিলাত যাব। গিয়ে দেখে আসব সেখানকার পকেটমারদের কীর্তিকলাপ, ফন্দি-ফ্যাঁচ। তারপর এসে তোমাদের সব শিখিয়ে দেব।"

এতক্ষণে সমবেত পকেটমাররা সকলেই আজকের মহতী সভার উদ্দেশ্য বুঝতে পারল, সবাইকে এখন কষ্টের টাকা দিয়ে সর্দারকে বিলেত পাঠাতে হবে। চুল্লু শেখ প্রশ্ন করল, অবশ্য একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, সর্দার তো ইংরেজি জানে না, বিলেত গিয়ে কি কিছু বুঝতে পারবে?

হাফিজ সর্দার পাকা লোক, এরকম প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আমি পিন্টুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।" পিন্টু একজন ছোকরা, ফিরিঙ্গি পকেটমার। সে ইংরেজিতেই কথা বলে।

কিন্তু সর্দারের কথা শুনে সাকরেদরা আরো ঘাবড়ে গেল। শুধু একজন নয়, সর্দার ছাড়া পিন্টুরও ভাড়ার টাকা তাহলে তাদের দিতে হবে। ব্যাপার বেশ গোলমেলে হয়ে উঠেছে, এমন সময় বুড়ো পকেটমার কাল্লু দাস, সে হাফিজেরই

সমবয়সী, হঠাৎ দুম করে বলে বসল, "সর্দার, তুমি তো গদিতে বসে বখরা নাও, তুমি কলকাতার পকেটমারিই শিখলে না, বিলেতের পকেটমারি কী শিখবে ?

ঘরের আবহাওয়া রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বচসা, চেঁচামেচি থেকে প্রায় হাতাতাতি পর্যন্ত! হাফিজ সর্দার অগ্নিবর্ণ চোখ করে খাটের ওপর থেকে তর্জন-গর্জন করতে লাগল। অবশেষে কয়েকজন ঠাণ্ডা-মাথার পকেটমার মধ্যস্থতা করে ব্যাপারটাকে আপাতত ধামা চাপা দিল।

কোনো কিছু সিদ্ধান্ত না নিয়েই সভা ভাঙতে বসেছে, এমন সময় দেখা গেল ঘরের শেষ মাথায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মোটা তারু খুকখুক, খুকখুক করছে। হাসছে না কাসছে, বোঝা যাচ্ছে না। হাসাই স্বাভাবিক, কারণ তারু লোকটা একটু ফাজিল, বিনা কারণেই হাসে। এমনকী পকেটমারার মোক্ষম মুহূর্তে, খদ্দেরের পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে নেওয়ার গোপন ক্ষণেও সে ফিক করে হেসে ফেলে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় তার এই অহেতুক হাসির কারণ কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। হাফিজ সর্দার তো ভীষণ খেপে গেল, চেঁচিয়ে উঠল, "এই মোটা তারু, এত হাসির কী হয়েছে।"

মোটা তারু হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়িয়ে তার জামার উপরের দুটো বোতাম খুলে গেঞ্জির ভিতরে হাত দিয়ে পাঁচ-সাতটা মানিব্যাগ বের করে আনল, তারপর গোটা চারেক ফাউণ্টেন পেন বার করল প্যাণ্টের সাইড-পকেট থেকে। যে-কোনো সফল পকেটমারের কাছেই কয়েকটা কলম বা মানিব্যাগ থাকবে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু আসল আশ্চর্যের বিষয় হল মোটা তারু যা জানাল সেই ব্যাপারটা।

মোটা তারুর বক্তব্য হল যে, এই মানিব্যাগ আর কলমগুলো সবই সে পাতাল-রেলের কামরা থেকে পকেট মেরে পেয়েছে। সবাই একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তা হলে কি তারু এর মধ্যে বিলেত আমেরিকা কোথাও থেকে ঘুরে এসেছে। তারু লোকটা ফাজিল কিন্তু মিথ্যে বাদী নয়, কিন্তু ও তো ইংরেজি-টিংরেজি জানে না, বিলেতে বা আমেরিকায় কী করে কাজ চালায়।

তারু বলল, "বিলেত-টিলেত নয়, এই কলকাতার পাতালরেল থেকেই এসব পেয়েছি।

তারু বলল, "গতকাল দুপুরে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে একটা ছয় নম্বর বাস তাক করছিলাম! এমন সময় দেখি গাড়ি করে লোকজন, বাবুসাহেব নেমে সবাই পাতালরেলের নতুন সিঁড়ি দিয়ে নামছে। আমিও তাদের পিছু নিলাম। কেউ

আমাকে ভাল করে খেয়ালই করল না।"

সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। তারু একটু থামতেই চেঁচিয়ে উঠল, "তারপর?"

মোটা তারু অল্পেই হাঁপিয়ে যায়, সে একটু দম নিয়ে বলল, "কী ঝলমলে, ঝকঝকে প্লাটফর্ম! সিঁদুর পড়ে গেলে সিঁদুর কুড়িয়ে নেওয়া যায় সেখান থেকে। তারপরে গাড়ির কামরা, সিট, সব চমৎকার। বাবুসাহেবরা সবাই খুশিতে ভরপুর হয়ে কামরায় কামরায় উঠে পড়ল, আমিও উঠলাম। সবাই আত্মহারা, গেটের কাছে যখন ধাক্কাধাক্কি করে সবাই উঠছে, আমি হাতিয়ে ফেললাম এই সব কলম, মানিব্যাগ।"

এরপর ধীরে-ধীরে তারু বর্ণনা করল কীভাবে পাতালরেলের কামরার দরজা খোলে, বন্ধ হয়। সিটের সারির বাঁকে ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়ালে হাত-সাফাইয়ের সুবিধে হবে।

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। 'পাতালরেলে পকেট মারো', এই নামে নতুন ট্রেনিং ক্লাস চালু হয়েছে কলকাতার পকেটমারদের জন্যে। বলাবাহুল্য, মোটা তারুই সেই ক্লাসের প্রিন্সিপ্যাল। হাফিজ সর্দারের বিলেত যাওয়া হয়নি। তার জন্যে সে খুব দুঃখিত নয়, পাতালরেল চালু হয়েছে আর তার আয়ও খুব বেড়ে গেছে। সর্দার এখন দিন গুনছে, পাতালরেল কবে পুরোপুরি চালু হবে কলকাতায়।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দাদুর দাঁদানো বাঁত

দাদু যখন সকালে বেড়াতে বেরোবেন তখন হাতে থাকবে পাকানো-পাকানো বেতের লাঠি। সে লাঠির কী বাহার। বাবা এনে দিয়েছিলেন মুসৌরি থেকে। আর যখন কোনো কাজে বেরোবেন তখন আর লাঠি নয়, তখন আমি তাঁর পাশে এক চলন্ত লাঠি। দাদুর ভারী ডানহাত আমার কাঁধে। আমার উচ্চতাও ওই লাঠিটার মতোই। দাদুর হাতে আমার কাঁধটা বেশ ফিট করে যায়। চলন্ত লাঠির গতি যখন বেড়ে যেতে চায় দাদুর হাত তখন কাঁধ খামচে ধরে পাশাপাশি টেনে আনে। আমার চেহারাটিও ঠিক লাঠির মতো। মা বলেন, খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দম। হবে না। অত খেলে কারুর চেহারা ভাল হয়। অষ্টপ্রহর মুখ চলছে। দুঃখ হয় কথা শুনে। কিছু বলতে পারি না। দেওকীনন্দন বলেছে, ঘাবড়াও মাত। চানা চালাও, বঠাক লাগাও, পবননন্দন বন যাও। ঘাড় হো যায়গা লোটা কা মাফিক। হাত হো যায়গা ডাম্বেল কা মাফিক। সমঝা ছোটা বাবু?

এখন আমরা চলেছি দাঁতের ডাক্তারের কাছে। আমাদের শহরে যেখানে বাজার সেখানে একটা জুতোর দোকানের পাশে ছোটমতো ডাক্তারখানা। ভাঁজ করা দরজার একদিকে একটা কাঁচের কেসে দুপাটি দাঁত সব সময় আমার স্কুলের পণ্ডিত-

মশাইয়ের মতো শীত নেই গ্রীষ্ম নেই খিঁচিয়েই আছে। আর-একপাশের দরজায় মাফলার জড়ানো গালফুলো এক মুখের ছবি। যন্ত্রণাকাতর। তলায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, দন্তশূল, তিন শূলের এক শূল। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না দিলে মরতে হয়। সামনের দিকে গালফুলোদের বসার জন্যে দুপাশে দুটো বেন্‌চ। ভেতর দিকে পর্দার আড়ালে একটা উঁচু চেয়ার। সেইখানেই ঠেসে ধরে সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত তোলা হয়। কোণের দিকে জলের কল, বেসিন। আমি দাদুর সঙ্গে চৌবাট্টিবার এই দোকানে এসেছি। কোথায় কী আছে সব মুখস্থ।

দাদুর ওপরের পাটিতে ষোলো, নীচের পাটিতে ষোলোটা দাঁত ছিল। সবই এই ডাক্তারবাবু একটা-একটা করে টেনে-টেনে তুলেছেন। বত্রিশ মাস সময় লেগেছে! দাদুর সে কী গর্ব সকলের নাকি বত্রিশটা দাঁত থাকে না। ঠিক ঠিক ওপরে ষোলোটা আর নীচে ষোলোটা, দুই মিলিয়ে ঠিক বত্রিশ দাঁত, লম্বা খাড়া নাক, টানা-টানা চোখ, মহাপুরুষের লক্ষণ। দাদুর সব-কটা লক্ষণই স্পষ্ট। তবে একটাই যা দুঃখ, দাদুর সব-কটা দাঁতই এই সিধুডাক্তারের সাঁড়াশি শেষ করে দিয়েছে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দাদু বোঝেননি। মা আমাকে বকেন। দাদুকে তো বকতে পারেন না। দাদু যে মায়ের বাবা। অত মিষ্টি খেলে কারুর দাঁত ভাল থাকে! দাদু আবার বাবাকে উপদেশ দেন, মিষ্টি খেয়েই বেশ ভাল করে কুলকুচো করে মুখ ধুয়ে ফেলবে, দেখবে দাঁত ঠিক থাকবে, একেবারে ছবির মতো। আশি বছরেও বসে বসে ছোলাভাজা চিবোচ্ছ। কচি কলাপাতা থেকে চেটে চেটে তেঁতুলের আচার খাচ্ছ টকাস টকাস শব্দে করে। দাদু যখন এই সব বলেন, আমি মনে মনে হাসি। যিনি বলছেন তিনি নিজেই এখন ফোকলা।

সন্ধে-সন্ধে হয়ে এসেছে। সিধুডাক্তার লিকলিকে একটা ধূপ জ্বেলে দেয়ালে টাঙানো তাঁর গুরুদেবের ছবির সামনে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার চুল ছুঁয়ে পিনপিন করে ধূপের ধোঁয়া উঠছে। গুরুদেবকে মোটেই ভাল দেখতে নয়। দাঁতের ডাক্তারের গুরুদেব বলেই বোধহয় সামনের দাঁত দুটো অত বড় বড়। ছবির দিকে তাকালেই আগে চোখ পড়ে যায় দাঁতে, তারপর গলার রুদ্রাক্ষের মালায়, তারপরই ভুঁড়িতে। কাউকে বলিনি ছবিটা দেখলেই আমার মনে হয়, একেই বলে টাস্ক ফোর্স। টাস্ক হল হাতির দাঁত, সেইটাই ফোর্সে বেরিয়ে এসেছে সামনে নিশ্চয়ই দেহ রেখেছেন। মহাপুরুষদের মৃত্যুকে বলে মহাপ্রয়াণ। আহা, দাঁত দুটো ডাক্তারবাবু যদি খুলে নিয়ে ওই শো-কেসে রাখতেন, যেখানে দুপাটি দাঁত মুখ ছাড়াই পড়ে পড়ে হি হি করে

ভূতের হাসি হাসছে। গুরুদেবের ছবির মাথার ওপর কাঠের ব্র্যাকেটে একটি মাটির গণেশ। ভারী ভাল মানিয়েছে। না বাবা, এসব ভাবব না। ওঁরা যেখানেই থাকুন যদি মনের কথা জেনে ফেলেন নির্ঘাত অঙ্কে ফেল করিয়ে দেবেন।

আমি হুড়মুড় করে দোকানে উঠতে যাচ্ছিলাম। দাদু টেনে ধরলেন, "দেখছ না পুজো হচ্ছে! হুড়মাড় করে ঢুকলেই হল। একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।"

দাদুর পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরেই সিধুডাক্তার ওই রকম কপালে ধুপসমেত হাত ঠেকানো অবস্থাতেই আমাদের দিকে ফিরলেন। চোখ আধবোজা। ঠোঁট নড়ছে বিড়বিড় করে। সেই ঠোঁটে আমাদের দেখে একটু হাসির রেখা উঠেই মিলিয়ে গেল। আমরা যে দিকে দাঁড়িয়ে আছি সেটা পশ্চিম। সূর্য ওই দিকে ডুবে গেছে অনেক আগে। উনি দিককেই নমস্কার জানাচ্ছেন। ঘুরে গেলেন দক্ষিণে। দক্ষিণ থেকে পুবে। পুবেই সেই দাঁততোলার বিদঘুটে চেয়ার। ওই দিকে একটু বেশিক্ষণ নমস্কার হল। ও দিকে সূর্য ওঠে। তা ছাড়া ওই দিকেই তো দাঁত তোলা হয়। দেয়ালে বড় বড় করে লেখা, ফাইভ রুপিজ এ টুথ, টেন রুপিজ এ ফলস টুথ। নিজের দাঁত ফেলতেও টাকা, নকল দাঁত লাগাতেও টাকা। তবে আসলের চেয়ে নকলের দাম পাঁচ টাকা বেশি।

ডাক্তারবাবু হাসি-হাসি মুখে বললেন, "আরে মুকুজ্যেমশাই, আসুন, আসুন।"

আমরা ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি বেন্চিতে বসলুম। দাদু বললেন, "তোমার পিতৃভক্তি দেখে মুগ্ধ হলুম।"

ঘাড় কাত করে ডাক্তারবাবু বললেন, "আজ্ঞে ওই জোরেই তো করে খাচ্ছি। ঘুষি মেরেও তো দাঁত ফেলা যায়, কিন্তু এমন খুস করে দাঁত ফেলতে কটা লোক পারে। ওই তো বিলেতফেরত জোয়ারদার। টেন রুপিজ এ টুথ। এমন হ্যাঁচকা টান মারে চোয়াল উপড়ে চলে আসে। এক দাঁত তুলতে আর-এক দাঁত তুলে ফেলে।"

"সে যদি বলো, আমার বেলাতেও তোমার হাতে একবার সেই কেস হয়েছে।"

"আজ্ঞে না মুকুজ্যেমশাই, ওটা আমি ইচ্ছে করে করেছিলুম। আমার চয়েস। দুপাটি দাঁতই তো আমার হাতে ছিল। সব-কটাই তোলার কেস, আগে আর পরে।"

"ও যতই বলো তুমি, মানব না, আমি উকিল মানুষ। ও তোমাদের আদত। দাঁত বুঝতে পার না। আমরাও যে কিছু বুঝতে পারব, সে উপায়ও রাখ না। ইনজেকশান দিয়ে অসাড় করে দাও। আর দাঁত তোলার সময় তোমাদের চোখ-মুখের চেহারাও অসুরের মত হয়ে যায়।"

"হেঁ হেঁ, কী যে বলেন!"

"হেঁ হেঁ নয়, চিরকাল তাই হয়ে আসছে। চোখেও ওই এক কিত্তি। ডান চোখে ছানি বাঁ চোখ কেটে ব্লাইন্ড করে দিলে। এরকম কেস আখচার হচ্ছে। যাক ওসব কথা। আমি এসে গেছি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন। আপনার দাঁত রেডি।"

ডাক্তারবাবু ভেতর থেকে নীল ভেলভেটে মোড়া দু'পাটি দাঁত নিয়ে এলেন। টেবিলে খুলে রাখতেই মনে হল মুখ ছাড়াই দাদু হেসে উঠলেন। জিনিসটা দেখতে আসল দাঁতের মতো অমন ধবধবে সাদা নয়, একটু হলদেটে। নকল দাঁতের সঙ্গে নকল মাড়ি লাগানো। ভেলভেট দিয়ে ঘষে ডাক্তারবাবু দাঁত দু'পাটি দাদুর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, "ফাসক্লাশ।"

দাদু ফোঁস করে উঠলেন, "তুমি ফাসক্লাশ বললেই তো আর ফাসক্লাশ হবে না, আমাকে পরে দেখতে হবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়, আপনি পরে নিন। পরে দেখে নিন।"

দাদু এত বড় হাঁ করে দাঁত দু'পাটি একে একে পরে ফেললেন। খটখট করে করে দুবার আওয়াজ হল। থলথলে মাংস ঝোলা ভালমানুষ-ভালমানুষ মুখটা কেমন যেন একটুখানি কঠোর-কঠোর হয়ে উঠল। দাদু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী, কেমন বুঝছ?"

প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণের সময় দাঁতের বাদ্য হল। দাদুর ভুরু কুঁচকে উঠল। অসুবিধে ধরে ফেলেছেন। আমি বললুম, "বেশ দেখাচ্ছে। তবে মুখটা যেন কী রকম বদলে গেল।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "বাঃ, তা দেখাবে না! যৌবন ফিরে এল যে। গালটাল সব ভরাট হয়ে গেল।"

দাদু বললেন, "সে আমি আয়নায় দেখব; কিন্তু কথা বলতে গেলে এই রকম দন্তবাদ্য হচ্ছে কেন! মনে হচ্ছে শীতকালে বরফজলে চান করে কথা বলছি।"

সত্যিই তাই। কথার পরেও কথা থেকে যাচ্ছে।

"ও মুকুজ্জেমশাই প্রথমপ্রথম একটু হবেই। নিজের দাঁত আর পরের দাঁত। তাছাড়া এতদিন মাড়ি খালি পড়ে ছিল, সেখানে হঠাৎ দাঁত এসে গেছে।

অ্যাডজাস্ট করে নিতে দু-একদিন লাগবে।"

"আরে, কালই যে আমার বড় আদালতে কেস আছে! ফ্রীডাম অফ স্পীচ না থাকলে বিপক্ষের উকিল তো আমাকে পথে বসিয়ে দেবে।"

তা হলে কাল না-হয় দাঁত খুলেই সওয়াল করবেন।"

"তুমি বুঝছ না ডাক্তার ফোকলা মুখে আইনের ভাষা ফসকে যায়, যেমন ধরো জুরিসপ্রুডেন্স, ম্যালাফাইড, লিটিগেশান, সাবজুডিস, অ্যাবরিভিয়েশান, অ্যাডজোর্নমেন্ট, অ্যালিমনি, সবই তো দন্ত্যোষ্ঠ্য বর্ণ। দাঁত ছাড়া সওয়ালের কামড় কমে যায়। আদালত তো কামড়াকামড়ির জায়গা। পাকা নয়, ডাঁসা পেয়ারায় কামড়। কাল আবার সেশান কোর্টে লড়াই।"

"তা হলে আজ বরং আপনি বাড়ি গিয়ে ঘণ্টা তিনেক অনর্গল কথা বলে যান, যত সব শক্ত শক্ত ল্যাটিন ফরাসি, গ্রীক আর ইংরেজি শব্দ। বেছে বেছে। তারপর কাপের জলে পাটি দু'পাটি ভিজিয়ে রেখে শুয়ে পড়বেন।"

"তা পড়ব, তবে কিছু একটু চিবিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। নতুন দাঁতের স্ট্রেংথ একটু টেস্ট করে দেখব না! যেমন ধরো চালভাজা, ছোলাভাজা।"

"একেবারে অতটা শক্ত জিনিস দিয়ে বউনি করবেন? সেটা ঠিক হবে না। সবই পারবেন, তবে ধীরে ধীরে, সইয়ে সইয়ে। আজ আপনি ভাত বা রুটি খান চিবিয়ে চিবিয়ে, সজনেডাঁটা খান। তারপর ধরুন লেড়ো বিসকুটে উঠলেন। প্রথমপ্রথম কামড়াবার জন্যে দাঁত একেবারে নিশপিশ করবে। মাড়ি সুড়সুড় করবে। যতই হোক নতুন দাঁত তো। শিশুদেরও নতুন দাঁত ওঠার সময় ওই রকমই হয়। জ্বর হয়, ঘ্যানঘ্যান করে, পেট খারাপ হয়, শক্ত বিসকুট পেলে কড়মড় করে চিবোয় আঙুল কামড়ে দেয়।"

"আমারও জ্বর, পেটখারাপ হবে নাকি ডাক্তারবাবু?"

"জ্বর হবে না, তবে পেটটা একটু সামলে আর একটা সাবধান করে দি, দাঁত দিয়ে কোনো কিছু কামড়ে ছিঁড়ে আনার চেষ্টা করবেন না।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন শাঁকালুর খোলা, কিংবা হাড় থেকে মাংস, আখ। ওই কুকুরে যেমন ছেঁড়াছিঁড়ি করে না, ওই জিনিসটি চলবে না, পাটি থেকে দাঁত খুলে যাবে।"

"তা হলে আর কী দাঁত বাঁধালে তুমি?"

"আজ্ঞে এ আপনি কী বলছেন! বাঁধানো দাঁত আর নিজস্ব দাঁতে একটু তফাত তো হবেই। নিজস্ব দাঁত এক-একটা মাড়িতে দু ইঞ্চি তিন ইঞ্চি শিকড়

চালিয়ে বসে আছে।"

আচ্ছা ডাক্তার, নিমদাঁতন করা যাবে?"

"সে কী! দাঁতন কেন করতে যাবেন শুধু শুধু!"

"শুধু শুধু? নিমদাঁতন শুধু শুধু? তুমি কী বলছ ডাক্তার? ডু ইউ নো হোয়াট ইজ নিম!" দাদু ভীষণ চটে উঠলেন। সিধুডাক্তার মিউমিউ করে বললেন, "আজ্ঞে না, আমি সেভাবে বলিনি, তবে এ দাঁতের তো মাজন আলাদা, তাই আর কি।"

"নিম কি শুধু মাজন, নিম হল অ্যান্টিসেপটিক, নিম ইজ এ মেডিসিন, পঞ্চবটের এক বট। আমি এই দাঁতেই নিমদাঁতন করব, আই মাস্ট, নিম ইজ মাই হেলথ, ওয়েলথ অ্যান্ড ফ্রেন্ড।"

কড়কড়ে তিনশো টাকা গুনে গুনে ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিয়ে দাদু আমার হাত ধরে উঠে পড়লেন। টেনরুপিজ এ টুথ হলে তিনশো কুড়ি হবে। কি জানি, পাইকারি দাম বোধহয় তিনশো।

বাড়ি ফিরে দাঁত পরে দাদু চেয়ারে বসলেন। মা তেল দিয়ে মুড়ি মাখছেন। প্রথমে মুড়ি চিবিয়ে দাঁত পরীক্ষা হবে। দেওকীনন্দন নারকেল ভাঙছে। দু-এক কুচি নারকেলও পরীক্ষা করবেন। বাবা এর আগে মুখ ভাল করে দেখে রায় দিয়ে গেছেন, ন্যাচারাল টিথে আপনার ফেসকাটিং যেমন ছিল, ফলস টিথে একটু বদলে গেছে। ঠিক সে-রকমটি হল না। সামনের ঠোঁট উঁচু হয়ে আছে। সেই শার্পনেসটা নষ্ট হয়ে গেল।

ওপরের ঠোঁটে হাতের চাপ দিতে দিতে দাদু থেকে থেকেই বলতে লাগলেন, "ও একটু উঁচু আছে তো কী হয়েছে, হাতের চাপে চাপেই ঠিক করে দেব। ওটার জন্যে ভাবি না। ভাবছি খুলে না পড়ে যায়।"

মা মুড়ি দিতে দিতে বললেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে। একবার হাসুন তো।"

দাদু লাজুক-লাজুক মুখে হাসলেন। মা বললেন, "বাঃ, কী সুন্দর হাসি। মুক্তোর মতো সাজানো দাঁতের সারি। আমাদের সকলের যদি এমন হত!"

"আমি খুব তাড়াতাড়ি অমন করে ফেলব মা। সামনের দুটো দাঁতে পোকা ধরিয়ে ফেলেছি।"

"বেশ করেছ। মাথা কিনে নিয়েছ।" মা হাত-পা নেড়ে মুখ ভেঙচালেন। দাদুকে বলে গেলেন, "বাবা, কাল থেকে নিমদাঁতন।"

দাদু বসে বসে নতুন দাঁতে মুড়ি পরীক্ষা করতে লাগলেন সঙ্গে আবার

নারকেলকুচি। মনেমনে ভাবলুম, হয়ে গেল, নতুন দাঁতের আজই বারোটা। পরে জানতে পারব, এখন পড়তে বসি।

পরদিন দাদু কোর্ট থেকে ফিরে এলেন। ফর্সা রঙে কালো চকচকে কোট। কেমন মানিয়েছে! বড় আদালতে কেমন লড়ে এলেন কে জানে! দাদুর পাশে থেকে থেকে আইনের ভাষা আমিও কিছু শিখে ফেলেছি। আজ বোধহয় সেই কেসটা ছিল ঃ ফেলারাম ভার্সাস নগেন দাস। একটা নারকেল গাছ নিয়ে দুই মক্কেলে দশ বছর ধরে লড়ে যাচ্ছে। দাদুর মুখ গম্ভীর। বেতের মোড়ায় বসে জুতোর ফিতে খুলছেন নিচু হয়ে। মা সামনে এসে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা হাতে তুলে নিতে নিতে বললেন, "কী হল বাবা? এত গম্ভীর?"

দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর কী হল? এই দ্যাখো।" কোটের পকেট থেকে দু'পাটি দাঁত বেরোল। এ কী, দাঁত মুখ থেকে পকেটে! দুটো গোল গোল চাকতি বেরোল। "দূর করে ফেলে দিয়ে আয় আঁস্তাকুড়ে।"

মা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কী!" দাদু ফেটে পড়লেন, "এই দাঁতের জন্যে আজ কনটেমপ্ট অফ কোর্ট হয়ে জেলে যেতে হচ্ছিল। নগেন দাসের উকিলকে আমি একেবারে ঠেসে ধরেছি। নারকেলগাছ ফেলারামের দিকে প্রায় এনে ফেলেছি। জজসাহেবকে প্রায় বুঝিয়ে ফেলেছি। মুখ দিয়ে ইংরেজির তুবড়ি ছুটছে। হঠাৎ ওপরপাটির দাঁত ঠকাস করে খুলে পড়ে গেল টেবিলের ওপর, আর এই চাকতির একটা সুদর্শনচক্রের মতো ঘুরতে ঘুরতে সোজা জজসাহেবের কপালে লেগে তাঁর টেবিলের ওপর। হোয়াট ইজ দিস? আমি উত্তর দেবার আগেই উকিল বলে উঠলেন, দ্যাট ইজ ওয়াশার স্যার। জজসাহেব ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে এল, কে ছুঁড়েছে। তিনি বললেন, ইট কেম ফ্রম হিজ মাউথ। আপনার মুখ এঁটো করে দিয়েছে। আমি তখন আর-একপাটি দাঁত নিয়ে টানাটানি করছি। না খুলতে পারলে কথা বলতে পারছি না, ক্ষমা চাইতে পারছি না। কী অপমানজনক ব্যাপার! বিরোধী উকিল বলছেন, ইট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ স্পিটিং অন ইওর ফেস মিলর্ড। প্রমাণ করতে চায় আমি থুতু দিয়েছি জজসাহেবের গায়ে। কেস ঘুরে কনটেমপ্ট অফ কোর্টের দিকে চলে যায়-যায়। তখন ফোকলা মুখে শুরু করলুম। ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি করে সেই কেসকে টেনে আনলুম আমার দিকে। তরী ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠল। কী অপমানজনক ব্যাপার বল তো! ফেলে দে, ফেলে দে, ওই দাঁদানো বাঁত।"

দাঁদানো বাঁত ? সে আবার কী ? উত্তেজনায় বাঁধানো দাঁত বলতে গিয়ে দাদু দাঁদানো বাঁত বলে ফেলেছেন। সেই দাঁত রাগ কমে যেতে দাদু পরেছিলেন। অভ্যাসও হয়ে গেল ; কিন্তু দাঁদানো বাঁত আর বাঁধানো দাঁত হল না। চিরকালের মতো উলটে রইল। সোজা আর হল না। যখনই বলেন, ওই ব্যাপার আমার দাঁদানো বাঁত।

দুলেন্দ্র ভৌমিক

দাদুর দাঁত

আমার মাতামহ দেবেন্দ্রপ্রতাপ গুহনিয়োগী ছিলেন রীতিমত জাঁদরেল লোক। আমি জন্মাবার পর থেকে আমার দাদুর নানারকম কীর্তিকাহিনীর গল্প শুনে আসছি। ইংরেজ আমলে তিনি 'রায়বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন। কেন পেয়েছিলেন, সেটা নিয়েও তিন-চাররকম গল্প আমাদের মাতুল বংশে চালু ছিল। দাদুর চেহারাটি ছিল দেখবার মতো। মাথায় পর্যাপ্ত সাদা চুল। মোটা ফ্রেমের চশমার নীচে বড়-বড় চোখ, গায়ের রঙ সাহেবদের মতো টকটকে ফর্সা, নাকের নিচে পুরু গোঁফ আর আঁটোসাঁটো শরীরের বাঁধুনি। এখন সত্তর পেরিয়ে গেছেন, কিন্তু দেখলে মনে হবে যেন সবেমাত্র পঞ্চাশ পেরিয়ে এলেন। বয়স বাড়লেও শরীরকে তেমন ক্ষয় হতে দেননি দাদু। শুধু একটাই গন্ডগোল, তা হল তাঁর দাঁত। শরীর-স্বাস্থ্য ধরে রাখলেও দাঁতটাকে ধরে রাখতে পারেননি। ষাটের কোঠায় পা দেবার পরেই তাঁর দাঁতে নানারকম সংকট দেখা দিতে থাকে। অবশেষে দাঁতের ব্যথা সইতে না পেরে তিনি তাঁর সব দাঁত তুলে ফেলে বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। টেরিটি বাজারের এক চিনা মহিলার দোকান থেকে তিনি যেদিন দাঁত বাঁধিয়ে ফেরেন, সেদিন আসবার সময় চাঁদনিচক থেকে একখানা আয়নাও কিনে আনেন।

আমরা তখন বড়মামার কঠোর শাসনে আসন্ন পরীক্ষার পড়া তৈরিতে ব্যস্ত। দাদুর কঠোর নির্দেশেই রোজ সন্ধেবেলা বড়মামা আমাদের পড়াতে বসাতেন। সে এক দেখবার মতো ব্যাপার। বড়মামা হাত নেড়ে নেড়ে এমনভাবে গ্রামার পড়াতেন, যেন হিন্দি ছবিতে মিউজিক কনডাক্ট করছেন। দিদিমা সন্ধেবেলা আহ্নিকে বসে মাঝে-মাঝে বিরক্ত হয়ে ছুটে আসতেন পড়ার ঘরে। বড়মামাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, "হ্যাঁ রে বিরু, পড়বে ওরা, তা তুই অত হাত-পা নেড়ে গলা ছেড়ে চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? এটা কি যাত্রা হচ্ছে নাকি?"

দিদিমার কথায় বড়মামা কান দিতেন না। তিনি বলতেন, "প্রকৃত শিক্ষাব্রতীকে সংযমী হতে হয়। সব কথায় কান দিতে নেই।"

অতএব তিনি কোনওদিকে কান না দিয়ে গ্রামার কোথা থেকে এল, কেন এল, আসাতে কী হল ইত্যাদি বিষয় যখন হাত নেড়ে বোঝাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই দরজায় এসে দাঁড়ালেন দাদু। দরজায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে সবার দিকে একবার দেখে নিয়ে হঠাৎ দাঁত বার করে হাসতে লাগলেন। দাদুর এই আচরণের কোনও মানে তখনও আমাদের কাছে ধরা পড়ল না। আমরা একটু ঘাবড়ে গেলাম। দাদু হঠাৎ যেমন হেসেছিলেন, তেমনই হঠাৎ আবার হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা এমন হল যে, দাদু যেন দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের মুখ ভেংচালেন। দাদুর মতো লোকের পক্ষে এমন কাণ্ড তো অবিশ্বাস্য! আমি মনে-মনে ভয় পেয়ে গেলাম। গোপাল বলে আমার এক সহপাঠী ছিল। তার দাদুর মাথা খারাপ হয়ে যাওয়াতে তাঁকে কয়েকদিন আগে চিকিৎসার জন্য রাঁচি পাঠানো হয়েছে। গোড়ার দিকে তিনিও লোক দেখলেই ভেংচি কাটতেন। পরে যখন মানুষজনকে কামড়াতে আরম্ভ করলেন, তখনই তাঁকে রাঁচি পাঠিয়ে দেওয়া হল। তবে কি আমার দাদুরও রাঁচি যাওয়ার পূর্বলক্ষণ দেখা যাচ্ছে! আমার বুকের মধ্যে হায়-হায় করে উঠল।

দাদু গম্ভীর হয়ে আছেন। এবার গম্ভীর গলাতেই জিজ্ঞেস করলেন, "এনিথিং ফাউণ্ড রং?"

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। আমরা শুনেছি শিক্ষিত বাঙালি পাগল হলে কেবলই ইংরেজি বলতে থাকে। দাদু বোধহয় পাগলই হয়ে যাচ্ছেন। আমি কিছু একটা বলতে হবে বলে বললাম,—"দাদু কখন এলে?"

দাদু গম্ভীর গলায় বললেন, "লুক অ্যাট মি অ্যাণ্ড সে, এনিথিং অ্যাবনর্মাল ইন মাই ফেস? ইফ এনি, প্লিজ টেল মি!"

দাদু আরও জটিল অবস্থার সৃষ্টি করলেন। পাগলের প্রাথমিক স্তরে তো মুখে কোনও চিহ্ন থাকে না। যা কিছু থাকবার, সেটা বোধহয় থাকে মগজের মধ্যে। সেই মগজ তো চোখে দেখা যায় না। অতএব, আমরা চুপ করে রইলাম।

দাদু এবার ঘরের ভেতরে এলেন। ঠোঁটের ওপর ক্ষীণ হাসি ফুটল। তিনি বললেন, "কাণ্ট ইউ ফলো মি? হতচ্ছাড়া বাঁদর, আমার দাঁতগুলো যে সব বাঁধানো, সেটা কি বোঝা যাচ্ছে?"

কথাটা বলেই তিনি মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে দু'পাটি দাঁত খুলে নিলেন।

আমরা যখন সবাই বললাম, না, একদম বোঝা যাচ্ছে না, একেবারে সত্যিকারের দাঁত মনে হচ্ছে, তখন দাদু খুশি হয়ে তার বাঁধানো দাঁতের চৈনিক কারিগরির বিশেষত্ব বোঝাতে লাগলেন। গ্রামার শেখা মাথায় উঠল। আমরা দাঁত-বিষয়ক আলোচনায় মেতে উঠলাম। দাদু বললেন, "কলকাতার সাতাশটা দোকান ঘেঁটে এই দোকানটা আমি বার করেছি। পৃথিবীতে এরাই হচ্ছে সেরা। আড়াইশো বছরের পুরনো দোকান। ওরা কলকাতার তিনজন ব্রিটিশ লাটসাহেবের দাঁত বাঁধিয়ে দিয়েছে। ওরা সবার দাঁত বাঁধায় না। আমি রায়বাহাদুর শুনে ওরা আমার কেসটা নিল। এই যে দাঁত একবার সেট হল, এটা আমার চিতা পর্যন্ত যাবে। একেবারে লিখিত গ্যারাণ্টি।"

দাঁত-বিষয়ক ব্যাপারটা যদি এখানেই মিটে যেত তা হলে কোনও সমস্যা হত না। কিন্তু আমার দাদু ছিলেন ভিন্নজাতের মানুষ। কোনও একটা ব্যাপার যদি একবার তাঁর মাথায় ঢুকত, তা হলে সেই বিষয়টা সকলের মাথাতে না ঢোকানো পর্যন্ত তাঁর শান্তি ছিল না। ফলে, তাঁর দাঁতের বিশেষত্ব তিনি যেমন আমাদের বাড়ির সবাইকে বোঝাতে লাগলেন, তেমনই বোঝাতে লাগলেন প্রতিবেশীদেরও। আমার ছোটমাসির বর, অর্থাৎ ছোটমেসো ছিলেন স্বভাবে এবং পোশাকে একেবারে সাহেব। দাদু যেদিন তাঁর ছোটজামাইকে খাবার টেবিলে দাঁত খুলে দাঁতের কারিগরি বোঝাতে লাগলেন, সেদিন রীতিমত অশান্তি ঘটে গেল। ছোটমেসো খাবার টেবিল থেকে উঠে গেলেন। ঘরে এসে ছোটমাসিকে বললেন, "আমি চললাম।"

ছোটমাসি তো অবাক! দু'দিন থাকবেন বলে এসেছেন। আধবেলা না যেতেই চলে যাবার কথা উঠছে কেন। তিনি চোখ বড়-বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, "চললাম মানে! আমাদের তো দু'দিন থাকবার কথা।"

ছোটমেসো গলার টাই বাঁধতে-বাঁধতে বললেন, "তোমার বাবা যদি কথায়-কথায় মুখের দাঁত খুলে ফেলেন, তা হলে আর এক মুহূর্তও থাকব না। ইতিমধ্যে দু'বার দাঁত খুলেছেন। বিশ্রী অভ্যাস।"

সত্যিই ছোটমেসোকে ধরে রাখা গেল না। জামাই রাগ করে চলে গেছে শুনে দিদিমা 'হায়-হায় করতে করতে দাদুর সামনে এসে ফেটে পড়লেন। দাদুকে দোষারোপ করে বললেন, "তুমি ওকে দাঁত দেখিয়েছ, তাতেই জামাই বাবাজীবন চলে গেছে।"

দাদু যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। চোখ কপালে তুলে বললেন, "লাঠি দেখালে কিংবা কুকুর লেলিয়ে দিলে মানুষ পালায়। বাঁধানো দাঁত দেখে জামাই পালাল কেন?"

দিদিমা তখন রাগে জ্বলছেন। মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, "তোমার বাঁধানো দাঁতটা কি কাঞ্চনজঙ্ঘা নাকি মিশরের পিরামিড যে লোক এলেই দেখাতে হবে! নিজের দাঁত নিজের মুখে না রেখে হরদম এত বাইরে আনা কেন। তোমার এই জামাই-তাড়ানো দাঁত আমি একদিন হামানদিস্তা দিয়ে গুঁড়ো করে দেব।"

দাদু বিচলিত হলেন না। চোখের চশমা খুলে খাপে ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, "যে-জামাই দাঁতের মর্ম বোঝে না, সে-জামাইয়ের এ-বাড়িতে আসবার দরকার নেই।"

ছোটোখাটো অশান্তি প্রায়ই ঘটে যেত, তবুও দাদুকে বদলানো যায়নি। দাদু বাষট্টি বছর বয়সে দাঁত বাঁধিয়েছিলেন। পুরো একটা বছর আমাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীকে দাদু আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছিলেন। এমনকী, দাদুর দাঁতের দৌলতেই বারোয়ারি পুজোর চাঁদা আদায়কারীরা এই বাড়িটাকে সভয়ে ছাড় দিয়েছিল। কারণ প্রথম চাঁদা আদায়কারীর দলটিকে তিনি দাঁত আর বাঁধানো দাঁতের তফাৎ, গুণাগুণ, চৈনিক দন্ত-বিশেষজ্ঞের বিশেষত্ব, নিজের দাঁতের মহিমা ইত্যাদি বিষয়ে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে হাতে-কলমে বুঝিয়েছিলেন যে, তারা পাঁচ টাকা চাঁদা আদায়ের পরিবর্তে বাড়ি ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান করাটাই অধিক শ্রেয় মনে করেছিল।

শুধু যে বাড়ির ছোটজামাই আর চাঁদা আদায়কারীরা পালিয়ে বেঁচেছিল, তাই নয়। আমার মামাতো বোন মিনুর গানের মাস্টার ধীরেনবাবুও একদিন পত্রযোগে বড়মামাকে জানালেন, "মাননীয় বিরুবাবু, আপনাদের গৃহে যাইয়া গত দেড় বৎসরের অধিককাল আমি আপনার কন্যাকে সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছিলাম। এযাবৎকাল এই শিক্ষাদানে কোনওরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই।

শুধুমাত্র শীতকালে মশকের উৎপাত ছাড়া আর কোনও অভিযোগ ছিল না। আমি যখন স্বকণ্ঠে আপনার কন্যাকে সরগম শিক্ষা দিতাম তখন প্রতি শীত ঋতুতেই গড়ে দুই-তিনটি করিয়া মশক আমার উন্মুক্ত মুখগহ্বরে অবলীলায় প্রবেশ করিত, কিন্তু আর বাহির হইতে পারিত না। মশক ভক্ষণ করিয়াও গত দেড় বৎসর নিষ্ঠা সহকারে সঙ্গীতশিক্ষা দান করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এইবার সত্যিই আমি অপারগ। আপনার শ্রদ্ধেয় পিতাঠাকুর সম্প্রতি যে নতুন দন্তপাটি পরিধান করিয়াছেন, তাহা দেখিতে অতীব সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই দন্তই আমার সঙ্গীত শিক্ষার আসরে প্রবল অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। ওই দন্ত যদি আমাকে দংশন করিত, তাহা হইলেও এতখানি বিচলিত হইয়া এই পত্র লিখিতাম না। রায়বাহাদুর মহাশয় দন্তের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে দন্তপাটি খুলিয়া লইয়া দেখাইতেন। কাহারও খোলা দাঁত দর্শন করা খুব নয়নসুখকর ব্যাপার বলিয়া আদৌ মনে হয় না। তবুও দেখিতাম। কিন্তু যেদিন রায়বাহাদুর মহাশয় তাঁহার দন্তপাটি খুলিয়া আমার গানের খাতার উপর রাখিলেন এবং আমার স্বরলিপির সেই পবিত্র পৃষ্ঠা আপনার পিতাঠাকুরের দন্তপাটির স্পর্শে সিক্ত হইয়া উঠিল, তখনই বুঝিলাম আমার সঙ্গীত সাধনায় এবার মোক্ষম কামড় পড়িয়াছে। আমার আশঙ্কা হইল, এমনও দিন ভবিষ্যতে আসিতে পারে, যেদিন হয়তো আপনার পিতাঠাকুর তাঁহার অতিপ্রিয় দন্তপাটি-জোড়া আমার ললাটে স্থাপন করিবেন। তাই মনে মনে প্রমাদ গণিলাম এবং আপনার কন্যাকে সঙ্গীত শিখাইবার চাকরি হইতে অবসর লইলাম। অতঃপর, কোথাও, কোনও গৃহে সঙ্গীত শিখাইবার দায়িত্ব লইবার আগে-আগেই দেখিয়া লইব, উক্ত গৃহে কাহারও দন্তপাটি নকল কি না।"

গানের মাস্টারমশাই চলে যাওয়াতেও বাড়িতে কম অশান্তি হল না। মিনু তো কেঁদেকেটে অন্নজল ত্যাগ করল। অগত্যা দাদুকেই কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হল গানের মাস্টারের জন্য। বক্স নাম্বারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। বিস্তর চিঠি এল। চিঠিগুলো বাছতে দেওয়া হল আমার বাবাকে। বাবা কালেভদ্রে এ-বাড়িতে আসতেন। তাঁর ছিল বাইরে-বাইরে ঘোরার চাকরি। তিনি বেছে বেছে পাঁচজনকে ডাকলেন। ইনটারভিউ নেওয়া হচ্ছিল ছোটমাসির বাড়িতে। যোধপুর পার্কের সেই বাড়িতে সেদিন দাদুও উপস্থিত। দাদু উপস্থিত বলেই ছোটমেসো বাড়িতে নেই। ইনটারভিউ দিতে প্রথমেই এলেন সেই ধীরেনবাবু। তিনি সবেমাত্র বসেছেন। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে একটি রাগাশ্রয়ী গান গাইতে যাবেন, কেবল সা-রে-গা পর্যন্ত আওয়াজ তুলেছেন, ঠিক তখনই ঘরে ঢুকলেন দাদু।

ধীরেনবাবু 'গা'তেই থেমে রইলেন এক মুহূর্ত। তারপর বাঘ দেখে হরিণছানার যেমন অবস্থা হয়, তেমন অবস্থায় তিনি তাড়াতাড়ি গানের খাতাটি তুলে নিয়ে 'ও, আপনি!' শুধু এই বাক্যটুকু উচ্চারণ করে একলাফে দরজা পেরিয়ে গেলেন। আমরা পেছন থেকে 'ধীরেনবাবু, ও ধীরেনবাবু বলে কাতর-কণ্ঠে ডাকাডাকি করতে লাগলাম, কিন্তু ধীরেনবাবু একটিবারও পেছন ফিরে তাকালেন না।

বছরখানেক পর অবশ্য দাঁত নিয়ে দাদুর বাড়াবাড়িটা কমে এল। মাঝে-মধ্যে প্রসঙ্গটা তুলতেন, কিন্তু সেটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়।

বাষট্টি থেকে সত্তর, এই আট বছরে দাঁত নিয়ে প্রথম বছর যা ঘটেছে তা বাদ দিলে আর বড় রকমের কোনও ঘটনা তিনি ঘটাননি। তবে সুযোগ পেলে দাঁতের গল্পটা তিনি করে যাচ্ছেন। শুধু গত বছর বাড়িতে কালীপুজোর সময় পুরোহিতের সঙ্গে যখন দাঁত নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন পুরোহিতমশাই বলেছিলেন, "আমার দাঁতও বাঁধানো। সেটাও বেশ চমৎকার।"

পুরোহিতের দাঁতের চাইতে আমার দাদুর দাঁত যে আরও চমৎকার এবং সে-দাঁতের সঙ্গে যে জগতের আর কোনও দাঁতের তুলনাই চলতে পারে না, সেটা বোঝাবার জন্য তিনি যথারীতি নিজের দাঁত খুলে ফেলেছিলেন এবং খোলা দাঁত হাতে নিয়ে প্রায় চ্যালেঞ্জ করার ভঙ্গিতে বলেছিলেন, "খুলুন, খুলুন দেখি আপনার দাঁত। কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন সেটা আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

পুরোহিতমশাই বিব্রত। দাদু ততক্ষণে আরেক পাটি দাঁত খুলে ফেলেছেন। ঠিক সেই সময় ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে পুরোহিতের কাতর আর্তনাদ ভেসে এল, "এইডা কী করলেন, আরে মশাই, এইডা কী করলেন। পুজা পণ্ড করলেন, সব্বোনাশ কইরা ছাড়লেন।"

আমরা হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, দাদু উত্তেজনার বশে ভুলক্রমে তাঁর একপাটি দাঁত পুরোহিতমশাইয়ের জলপূর্ণ কোষার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। আর এই ঘটনা দেখে উত্তেজিত পুরোহিতমশাই তাঁর আসনের ওপর লাফাচ্ছেন আর বলছেন, "অনাচার হইয়া গেছে, অনাচার হইয়া গেছে।"

দিদিমার কানে খবরটা যাবার আগেই নতুন কোষাকুষি আনিয়ে পুজোর ব্যবস্থা করতে হল। গত বছরের এই ঘটনাটুকু বাদ দিলে আর তেমন কিছু ঘটেনি। দাঁত নিয়ে গুরুতর ঘটনাটা ঘটল মাত্র কয়েকদিন আগে।

দাদু রোজ বিকেলে গিলে-করা পাঞ্জাবি, তাঁতের চওড়া পাড় ধুতি আর নিউকাট জুতো পরে বেড়াতে যান। কোনও পার্কে-টার্কে তাঁর যাওয়ার অভ্যাস নেই। তা ছাড়া ধারেকাছে তেমন ভাল পার্কও নেই। তাই দাদু চলে যেতেন রেলস্টেশনে। প্ল্যাটফর্মের ওপর একটু বেড়াতেন, তারপর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতেন ওভারব্রিজে। ওভারব্রিজের মাঝখানে দাঁড়ালে গায়ে খুব হাওয়া লাগে। আমি দাদুর সঙ্গে বার-দুই ওভারব্রিজে উঠে দেখেছি, দাদুর একটি বিচিত্র অভ্যাস আছে। লাইন দিয়ে কোনও মালগাড়ি গেলে তিনি দু'হাতে ব্রিজের রেলিং চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গিতে নীচে তাকাতেন এবং মালগাড়ির বগি গুনতেন। আমি সঙ্গে থাকলে আমাকেও গুনতে বলতেন। কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের দু'জনের গণনা কখনওই একরকম হত না। আমি যদি বলতাম, ছাপ্পান্ন, দাদুর তা হলে হত সাতান্ন, না হয় পঞ্চান্ন।

সেদিন বিকেলে আমি আর দাদু ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছি। রোজ এসময় একটা মালগাড়ি যায়। মালগাড়ির যাওয়া নিয়ে আমার কোনও চিন্তা ছিল না। বরং না এলেই আমি খুশি হই। কিন্তু আমাকে খুশি করবার জন্য তো মালগাড়ি বাতিল হতে পারে না। অতএব, কিঞ্চিৎ বিলম্বে এলেও শেষ পর্যন্ত মালগাড়িটা এসে গেল। দাদু যথারীতি রেলিঙের ওপর ঝুঁকে মুখ নীচের দিকে নামিয়ে বগি গুনতে আরম্ভ করলেন। দাদুর পাশে দাঁড়িয়ে আমাকেও তা-ই করতে হল।

দাদু আরম্ভ করলেন, ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর....

আমি অবশ্য গুনছিলাম না। দাদুরটা শুনেই বলে দিতে পারব বলে আমি শুধু গোনার ভান করে যাচ্ছিলাম।

দাদু ততক্ষণে গুনে চলেছেন, "থারটি ফাইভ, থারটি সিক্স, থারটি সেভেন...."

আমিও দাদুকে শুনিয়ে একবার বললাম, "ফরটি ওয়ান।"

দাদু বলে যাচ্ছেন, "ফরটি টু, ফরটি থ্রি, ফরটি ফোর, ফরটি ফাইভ, ফরটি সিক্স....হ্যাঁচ্চো! ফরটি সেভে—....

সেভেনটা আর উচ্চারণ করতে পারলেন না, তার আগেই প্রায় আর্তনাদ করার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, "সব্বোনাশ হয়ে গেছে রে।"

আমি বললাম, "কী হল?"

দাদু বিমর্ষভাবে ঠোঁট ফাঁক করে দেখালেন। আমি দেখলাম, দাদুর ওপরের পাটির দাঁত উধাও। আমি অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "দাদু, তোমার দাঁত কোথায়?"

ব্রিজের নীচ দিয়ে তখনও মালগাড়িটা চলে যাচ্ছে। দাদু আঙুল দিয়ে সেই চলমান গাড়িটা দেখিয়ে বললেন, "ওরই কোনও খোলা বগিতে পড়ে গেছে।"

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। আমি বললাম, 'সে কী! ওখানে গেল কেমন করে?"

দাদু বললেন, "নিচু হয়ে গুনতে গুনতে হঠাৎ হাঁচি এসে গেল। হাঁচি দেবার সময় দাঁত খুলে নীচের একটা খোলা বগিতে পড়ল।"

আমি বললাম, "এখন কী হবে?"

দাদু একটু চিন্তা করে বললেন, "ফরটি সিক্স-এর সময় হাঁচিটা আসে।" দাঁত ওই ফরটি সিক্স নাম্বার বগিতেই পড়েছে। চল তো একবার স্টেশন মাস্টারের কাছে যাই।"

স্টেশনমাস্টার দাদুর বিশেষ পরিচিত। দাদুকে দেখে বেশ খাতির করলেন। দাদু বললেন, "এই মালগাড়িটাকে একটু থামানো যায়?"

স্টেশনমাস্টার অবাক হলেন। এরকম অনুরোধ বোধহয় তাঁর চাকরি-জীবনে তিনি কখনও শোনেননি। তিনি বললেন, "কেন, কী হয়েছে?"

দাদু চেয়ারে বসে পড়ে হতাশ গলায় বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে। ওভার-ব্রিজের ওপর থেকে হাঁচি দিতে গিয়ে ওপরের পাটির দাঁত খুলে পড়ে গেছে মালগাড়ির বগিতে। ওটা আমাকে এনে দিতে হবে।"

স্টেশনমাস্টার চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, "কী পড়েছে? দাঁত? আপনার দাঁত মালগাড়ির বগিতে? সেটা কী করে সম্ভব?"

দাদু টেবিলে চড় মেরে বললেন, "আলবত সম্ভব। হাঁচির ঝটকায় দাঁতটা খুলে গেছে। ওটা উদ্ধার করে দিতে হবে।"

স্টেশনমাস্টার চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "নিয়ম নেই। যদি কোনও মূল্যবান জিনিস হত, মানে যাকে বলে ভ্যালুয়েবল আর্টিকল, ধরুন আপনার অ্যাটাচিকেস, কোনও স্যুটকেস, ট্রাঙ্ক—না-না, তাও বা চলমান গুডস ট্রেনে কেমন করে যাবে!"

দাদু এবার খেপে গেলেন। বললেন, "তোমাদের কেমন আইন হে, দাঁতের চাইতে অ্যাটাচিকেস হচ্ছে ভ্যালুয়েবল আর্টিকল! দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝতে পারছ না। এটা তো হিউম্যান প্রপার্টি। এটার জন্যে কেন মালগাড়ি দাঁড় করানো হবে না!"

দাদুর গর্জনে এবং পীড়াপীড়িতে স্টেশনমাস্টার ফোন করলেন কল্যাণী স্টেশনে। গোটা বৃত্তান্ত শোনার পর ওদিক থেকে কী উত্তর এল, সেটা শোনা

গেল না বটে, কিন্তু স্টেশনমাস্টারের মুখ দেখে বোঝা গেল, খুব মধুর কোনও উত্তর আসেনি। টেলিফোন নামিয়ে রেখে স্টেশনমাস্টার বললেন, "আমি দুঃখিত। আমি আপনার দাঁত উদ্ধার করতে অক্ষম।

দাদু বললেন, "আমি জানতাম তোমার দ্বারা হবে না। আমি বাড়ি গিয়ে আজই তোমাদের কমার্শিয়াল সুপারিনটেনডেন্টকে চিঠি লিখে কমপ্লেন করছি। দাঁত আমার চাই-ই চাই। তুমি খালি গাড়ির নম্বরটা বলো।"

বাড়ি ফিরে দাদু শুরু করলেন চিঠি লেখা। বলাই বাহুল্য, সেই চিঠির কোনও জবাব এল না। দাদু গেলেন ভীষণ চটে। এবার লিখলেন রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে। ম্যানেজার দাদুকে কী উত্তর দিয়েছিলেন জানি না। অনুমানে বুঝতে পারি আশাপ্রদ তেমন কিছু নয়। দাদুও থামবার পাত্র নন। তিনি প্রশ্ন করলেন, প্রপার্টি হিসেবে রেল কেন আমার দাঁতকে গণ্য করবে না। ভারতীয় রেল যদি দাঁতের মর্ম না বোঝে, তা হলে এর চাইতে পরিতাপের বিষয় আর নেই।

দাঁত খোয়া যাবার পর দাদুর সারাদিনের কাজ হল কেবল চিঠি লেখা। পুরনো একটা টাইপরাইটার মেশিন পর্যন্ত কিনে ফেললেন। দাঁত উদ্ধারের জন্য দাদুর তৎপরতা এমন জায়গায় গিয়ে পেঁছল যে, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-বন্ধু সবাই একবার দাদুকে দেখে যেতে লাগলেন এবং একই প্রশ্ন করতে লাগলেন, "দাঁত পেলেন?"

দাদুর ঘরে তখন চিঠিপত্র রাখবার জন্য গোটাদশেক ফাইল এসে গেছে! রেলমন্ত্রকের নানা দপ্তরে তিনি চিঠি দিয়েছেন। এমনকী, রেলমন্ত্রীকেও। প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিকেও চিঠি দেবার কথা ভেবেছেন। যদি তাতে কোনও ফল না হয়, তা হলে রেলের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় কি না তাই নিয়ে যখন ভাবছেন, তখন একদিন সকালে স্টেশনমাস্টার শালপাতার ঠোঙায় করে দাদুর দাঁত নিয়ে এসে হাজির হলেন। আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম দাদুর দাঁত দেখবার জন্যে। দাদু অন্য পার্টির সঙ্গে মেলালেন। আমাদের সবার মতামত নিলেন। অবশেষে চোখ পিটপিট করতে করতে বললেন, "দাঁতটা ঠিক চেনা মনে হচ্ছে না। একটু অন্যরকম লাগছে।"

স্টেশনমাস্টার সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, "লাগবেই তো। দাঁতটা কত কিলোমিটার ট্রেন জার্নি করে এল, সেটা ভেবে দেখেছেন? ওটা এল মোগলসরাই থেকে। ধকল গেছে তো।"

দাদুর সন্দেহ তবু গেল না। দাঁতটা সরিয়ে রেখে বললেন, "তবু শিওর হবার জন্য কিছুটা সময় লাগবে।"

স্টেশনমাস্টার সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, "তা লাগুক। ভাল করে দেখে শুনে তবে মুখে ঢোকাবেন। আপনি বরং এই কাগজটায় সই করে জানিয়ে দিন যে, আপনার প্রপার্টি আপনি পেয়েছেন।"

দাদু খানিক ভেবে নিয়ে কাগজটায় সই করে দিলেন। দাদুর মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল, কিন্তু আমরা সবাই জোর দিয়ে বলাতে উনি রাজি হয়ে গেলেন।

স্টেশনমাস্টার সই-করা কাগজটা খুব যত্ন করে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। যাবার আগে আমাকে ইশারায় ডেকে বাইরে এসে বললেন, "আপনার দাদু আমাকে পাগল করে ছেড়েছেন। রেলের বড়কর্তারা জানিয়েছেন, যা হোক একটা ব্যবস্থা করে পাগলকে শান্ত করুন। উনি নাকি আমরণ অনশনের হুমকি দিয়েছেন রেলমন্ত্রীকে। ভেবেছিলাম, একজোড়া দাঁত কিনে দেব। কিন্তু কিনতে হল না। ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন।"

আমি চমকে উঠে বললুম, "জুটিয়ে দিয়েছেন মানে ?"

স্টেশনমাস্টার চাপা গলায় বললেন, "আমার শ্বশুরমশাই রাত্রে গেলাসে দাঁত ভিজিয়ে ঘুমোতে যান। এবার বেড়াতে এসে দাঁত ভিজিয়েছেন এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে ফার্স্ট লালগোলা ধরে বহরমপুর চলে গেছেন। ভেজা দাঁত আর গেলাস থেকে তোলবার কথা মনে ছিল না। ট্রেন এসে গেছে বলে তাড়াহুড়ো করে লালগোলা ধরতে ছুটেছেন। শ্বশুর অন্তত তাঁর দাঁতের জন্য জামাইয়ের নামে রেলমন্ত্রকে চিঠি লিখবেন না। তাই শ্বশুরের দাঁতটা আপনার দাদুকে দিয়ে আমি বাঁচলাম, আমার চাকরি বাঁচল, আমার চোদ্দপুরুষ বাঁচল।"

কথা শেষ করেই স্টেশনমাস্টার যেন মুক্তির আনন্দে ভাসতে ভাসতে ছুটে চলে গেলেন তাঁর স্টেশনের দিকে।

অবন বসু

পাগল আর ধূম পাগল

আজ্ঞাবাবু ঘুম ভাঙা মাত্রই তড়াক্ করে এক তুড়িলাফ মেরে খাট থেকে নামলেন। আজ শুক্রবার। তাঁর একটা সাংঘাতিক কাজের দিন। একটুও দেরি করা চলবে না। আজ দেরি করার মানেই হল সপ্তাহের বাকি দিনগুলো প্রাণ হাতে করে কাটানো। আজ্ঞাবাবু হ্যা হ্যা করে গলা খাঁকারি দিতে দিতে বাথরুমের দিকে ছুটলেন।

ততক্ষণে শম্ভু রক্ষিত দুটো মুষকো গোয়ালাকে নিয়ে হাজির হয়ে গেছিল। গোয়ালাদুটো বারান্দার ওপরেই খালি গায়ে বুক ডন দিতে লাগল। আর আজ্ঞাবাবু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন পাঁচ মিনিটে। তারপর একটা গামছাকে ল্যাঙোটের মত করে পরে, গামছার কোমরের দিকটায় একটা বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বললেন "বাবা শম্ভু, আজ একটু ভাল করে ধরিস। গেল সপ্তাহে তোর হাত ফসকে দুটো বেরিয়ে গিয়ে কী কাণ্ড বাধালো তো দেখলি। আর যেন ওরকম না হয়।"

শম্ভু রক্ষিতের চেহারাটা অনেকটা কঞ্চির মাথায় ভারী আশুত্রে বসানোর মত। তার ওপর ফাটা চশমার কাঁচ বেয়ে চোখ দিয়ে সব সময়ে জল পড়ে। চশমা থেকে অনেকটা জল মুছে সে বলল "না কর্ত্তা, আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। নির্ভয়ে থাকেন।"

কিন্তু তার হাড়-জিরজিরে বুকের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে থাকবেন কি, একটা লম্বা-চওড়া শ্বাস বেরিয়ে আসে আজ্ঞাবাবুর বুক চিরে। তাঁকে সাহায্য করার মত শক্তপোক্ত কেউ পাশে নেই, এটা তিনি ভালমতই জানেন।

পরনের নোংরা ধ্যাধধেড়ে পাজামাটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তাতে দুটো সেফটি-পিন লাগাতে লাগাতে শম্ভু খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলল "তাছাড়া মগা আর ছগা আজ এক ফোঁটাও তাড়ি খায়নি। ওরা বলেছে, জান লড়িয়ে দেবে।"

মগা-ছগা মানে মগনলাল আর ছগনলাল। যমদূতের চেহারার ঐ গোয়ালা দু'ভাই তখনো বারান্দায় বুক ডন দিচ্ছিল। তারা ডোরাকাটা আণ্ডারওয়্যার পরা তেলমাখা চেহারাতে আরো খানিকটা রাগী রাগী ভাব এনে বলল "হ্যাঁ, কুছু ডর নাই। আজ সামাল দিব।"

কিন্তু আজ্ঞাবাবু জানতেন গরু দোয়াতে দোয়াতে লোক দুটো গরুর চেয়েও ভীতু হয়ে গেছে। ওদের দিয়েও কিস্সু হবে না। তাই তিনি ওঁর পেল্লায় ইঁদুরের খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে এক বিকট চিৎকার ছাড়লেন "রেডি, স্টার্ট! মিউজিক অন।"

শম্ভু রক্ষিত বা গোয়ালা দুটোর কেউই এ জন্মে ইংরেজি শেখেনি। কিন্তু শুনতে শুনতে শব্দগুলোর মানে বুঝে গেছে তারা। তাই আজ্ঞাবাবুর কথা ফুরোতে না ফুরোতেই মগা-ছগা দু'ভাই বুকডন ছেড়ে 'হু র‍্যা র‍্যা র‍্যা' করে বিকট চেঁচিয়ে উঠল, আর শম্ভু রক্ষিত একটা গুবো কাঁসার থালায় সাঁড়াশি পেটাতে পেটাতে কান ফাটানো আওয়াজ তুলতে লাগল।

দুটো বিকট শব্দ একসঙ্গে মিশে এর মধ্যেই আজ্ঞাবাবুর রক্ত অসুরের মত গরম হয়ে গেছিল। তিনি হাতের তিন-ডজনী ইঁদুরের খাঁচাটা বাগিয়ে ধরে আবার হুঙ্কার ছাড়লেন "মার্চ ফরোয়ার্ড, অ্যান্ড অ্যাটাক্!"

দলের বাকি তিনজন এ-কথাটারও মানে বুঝল না। কিন্তু অভ্যাসমত সঙ্গে সঙ্গেই 'ফিনাইল' লেখা তিনটে বোতল তুলে নিয়ে একটা বন্ধ ঘরের দিকে ছুটে গেল। আর আজ্ঞাবাবুও উত্তেজনা চাপতে না পেরে "খবরদার! হুঁশিয়ার" এইসব বলতে বলতে ওদের পিছনে ছুটলেন।

এদিকে এসবের মধ্যেই কিছুটা বেলা বেড়ে বাজার-হাটের সময় হয়ে গেছিল। সরকারী দুধ দিচ্ছে লাইন গুণে। পাড়ার লোকেরা থলে-বোতল হাতে ঘর থেকে বেরিয়েই আজ্ঞাবাবুর বাড়ি থেকে ঐ বিকট আওয়াজ শুনতে পেল। যারা ভীতু, তারা অনেকেই ওরকম নিদারুণ আওয়াজ শোনামাত্র একছুটে আবার বাড়ীতেই ঢুকে গেল। আর যারা একটু সাহসী কিম্বা বুদ্ধিমান, তারা দাঁড়িয়ে বলল,

"এই রে, আজ্ঞাবাবু আজ আবার পাগল স্নান করাচ্ছেন।"

অর্থাৎ আজ্ঞাবাবুর পাগলা-গারদের কথাটা তাদের আর জানতে বাকি নেই। অবশ্য না-জানারই বা কী আছে? আজ্ঞাবাবু তো আর লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করছেন না। রীতিমত পাড়া কাঁপিয়েই করছেন। তাই জানাটাই স্বাভাবিক। তবে কিনা, যারা একটা আদর্শ পাগলা-গারদের কাজকর্ম দেখেনি আগে, তারা একটু ভয় পাবে বৈকি!

অনেকে তাই ভয় পায়। কিন্তু আজ্ঞাবাবু তা বলে দমেননি। রাস্তাঘাটে যেসব পাগলেরা পাঁউরুটির মোড়ক কিম্বা চিনেবাদামের খোসা খায়—যেসব পাগলেরা প্যান্টের বদলে ঝুড়ি পরে, ট্রাফিক পুলিশ হয় কিম্বা মাথার জটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে একা একা অংক করে—তাদের তিনি ভুলিয়ে ভালিয়ে নয়তো তাঁর তৈরি 'অচেতনী বটিকা' নামে একটা অজ্ঞান হবার ওষুধ খাইয়ে তাঁর পাগলা গারদে ধরে আনেন। এর জন্য ম্যালা খাটুনি তাঁর। তবু তিনি কাজে ফাঁকি দিতে জানেন না।

অনেক খেটেখুটে গত দেড় বছরে মোটে সতেরোটা পাগলকে ধরেছেন তিনি। আর এই নিয়েই তাঁর পাগল গবেষণা কেন্দ্র। পাগল-গবেষণার এই ব্যাপারটা আজ্ঞাবাবুর মাথায় ঢোকে অনেক ছোটবেলা থেকেই। লোকে বলে বটে, এটা তাঁর বাড়ির কারণে, কিন্তু তিনি তা মানতে নারাজ। অবশ্য সামনে না বললেও লোকে আড়ালে বলেই যে, আজ্ঞাবাবু মানে কিনা আজ্ঞাপদ আচার্য, কিম্বা প্রজ্ঞাবাবু, মানে তাঁর বাবা প্রজ্ঞাপদ আচার্য, কিম্বা তাঁর বাবা বিজ্ঞপদ আচার্য এমনকি তাঁরও বাবা যজ্ঞপদ আচার্যও স্রেফ পাগলই ছিলেন। নেহাৎ পুলিশ কিম্বা পাগলের ডাক্তার তাঁদের কখনো ধরেনি, তাই।

তা, এসব কথা সামনে নাই শুনুন, আড়াল-আবডাল থেকে এমন একটা আভাস যে আজ্ঞাবাবুর কানেও যায়নি, তা নয়। তাই ছোটবেলা থেকেই তিনি বংশের পাগল-দুর্নাম ঘোচাতে, মানে অন্যান্য পাগলদের চিকিৎসা করে গায়ের জ্বালা মেটাতে চাইতেন। তারপর একটু বয়স বাড়তে তিনি যে বংশের সুনাম রেখে একটা উন্মাদ-আশ্রমের ডাক্তার হয়েছিলেন, সেকথা কে না জানে? অবশ্য লোকে বলে, ডাক্তার-ফাক্তার নয়, তিনি একটা পাগলা-গারদে পাগল-পেটানোর চাকরিই পেয়েছিলেন, আর সেখানে পাগল ঠ্যাঙানোর নামে রাতদিন উদ্ভট কাণ্ড-কারখানা শুরু করায়, তাঁর চাকরিটা খোয়া গেছে।

তবে লোকে অমন অনেক কথাই বলে। তারা যা খুশি বলুকগে, মোদ্দা ব্যাপার হল, পাগলা-গারদের সেই চাকরিটা ছাড়ার পর তিনি নিজেই একটা

পাগল-গবেষণা কেন্দ্র খুলেছেন, আর দেড় বছর ধরে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গেই পাগলদের চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। এটাই বড় কথা, এবং একটা বংশের নাম রাখার মত কথাও বলা যেতে পারে।

আজ্ঞাবাবুর পাগল স্নান করানোর পিছনেও একটা ইতিহাস আছে। তিনি যখন ঐ সরকারী পাগলখানায় চাকরি করতেন, কতগুলো ব্যাপার দেখে ভারী চটে যেতেন। যেমন, সেখানে কোন পাগল স্নান করানোর ব্যবস্থা নেই, পাগলরা নিজেদের মধ্যে খেলাধুলোর সুযোগ পায় না, এমনকি পাগলদের জামাকাপড়েও কোন নতুনত্বের লক্ষণ নেই।

যা আছে, তা হল স্রেফ পাগলগুলোকে যাচ্ছেতাই ভাবে পেটানো। আজ্ঞাবাবু ভেবে পান নি, এর মধ্যে গবেষণাটা কোথায়? আর গবেষণাই যদি না থাকল, তবে খামোখা রাস্তার পাগলদের রাস্তা থেকে ধরে এনে লাভই বা কী?

নিজে গবেষণাগার খুলে আজ্ঞাবাবু তাই প্রথমেই পাগল স্নান করানোর একটা বিধি-ব্যবস্থা খুলেছেন। সপ্তাহে একদিন সমস্ত পাগলকেই স্নান করতে হবে। শীত গ্রীষ্মে একই নিয়ম। আর শুক্রবার হল সেই স্নানের দিন। একটা সাঙ্ঘাতিক দিনও বলা যায়। স্নান করানোর সময়ে পাগলেরা পালিয়ে যেতে পারে, কামড়ে গায়ের মাংস কি মাথার চুল খুবলে নিতে পারে। এমনকি একটু বেশি ভুল হয়ে গেলে জলে চুবিয়ে মেরেও ফেলতে পারে। শম্ভু রক্ষিতকে একবার সেভাবেই প্রায় শেষ করে ফেলেছিল ওরা। নেহাৎ আজ্ঞাবাবুর হাতে ইঁদুরের খাঁচা ছিল বলে সবটা পারেনি। প্রথম প্রথম যখন তাঁর দু-তিনটে পাগল ছিল, আজ্ঞাবাবু নিজেই তাদের স্নান করাতেন। তারপর পাগলদের সংখ্যা বাড়তে শম্ভু রক্ষিত নামে একটা ভবঘুরেকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট করে রেখেছেন তিনি। আর গত মাসে তাঁর পাগলা-গারদ ভেঙে তিনটে পাগল পালিয়ে যাবার পর শম্ভুর কথাতেই আরো দুটো হিন্দুস্থানী গোয়ালা-পালোয়ানকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। মগন আর ছগন। তবে লোকদুটো ভারী ভীতু। পাগলদের খুব ভয় পায়, তিনি লক্ষ্য করেছেন। গত সপ্তাহে ওদের জন্যই তো স্নানের সময় দুটো ছিটকে-সটকে গেছিল। অবশ্য আবার ধরাও পড়েছে তারা।

শম্ভু তাই আজ অনেক আঁটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছে। সকাল থেকে চোখে চোখে রেখে গোয়ালা দুটোকে ছিঁটেফোঁটাও তাড়ি গিলতে দেয়নি, আর নিজে একটা হাত সাতেক সুতোয় বাঁধা পোয়াটাক ওজনের মাদুলী পরে এসেছে। শ্মশান ডাঙার এক কাপালিকের থেকে নগদ তিন টাকা আর একটা গামছা দিয়ে মাদুলীটা কেনা। কাপালিক বলেছে চোর-ডাকাত, সাপ-খোপ কিম্বা পাগল-

ছাগল নাকি মাদ্বলীটা থাকলে—ক্ষতি করা দ্বরে থাক, কাছে পর্যন্ত ঘেঁষতে পারে না।

অবশ্য ঐ মাদ্বলীর সাহসেই শম্ভু একটা বিরাট ভুল করে বসল আজ। আজ্ঞাবাবু কোমরের ঘুনসি থেকে ইয়াব্বড় পেতলের চাবির গোছা বার করে যেই পাগলখানার দরজাটা খুলেছেন, শম্ভু ঠিক মগনলাল আর ছগনলালের ঢঙে 'দ্ব র‍্যা র‍্যা র‍্যা' করে একবার চেঁচিয়ে ফেলল। আর যায় কোথায়? ঘরের অন্ধকারে চোখ বুজে শুয়েছিল কিম্বা একা একা 'লেফ্‌ট রাইট' করে প্যারেড করছিল যেসব পাগল—তারা একেবারে যমের মত আজ্ঞাবাবুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পালের গোদার মত আজ্ঞাবাবুদের দলের ঠিক সামনেই ছিল মগনলাল। গোয়ালা দু'ভায়ের মধ্যেও বয়স আর চেহারা—দুটোতেই সে বড়। তাই পাগল-গুলো আগে পেয়ে গেল তাকে। আর পেয়েই কী বিভীষিকার মত চড়-গুঁতোর ঝাপ্‌টা! কিলিয়ে, ঘুষিয়ে, আঁচড়িয়ে, কামড়িয়ে পাগলগুলো যেন মগনলালের আর কিছু বাকি রাখতে চায় না।

এদিকে আজ্ঞাপদবাবু কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আক্রমণের বা প্রতি-আক্রমণের একটা ধারা হয়। কিন্তু এ কোন্ ধারা রে বাবা! তাছাড়া, শম্ভু রক্ষিতের ওপর রাগেও তাঁর দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল। এতদিন ধরে তিনি পাগল অ্যাটাকের নিয়ম-কানুনগুলো শিখিয়েছেন ওদের। আর শম্ভু কিনা শেষ মুহূর্তে অমন চেঁচিয়ে উঠল! স্নানের জন্য পাগল ধরার নিয়ম হচ্ছে, অতর্কিতে পা টিপে টিপে যাওয়া। আর তারপরই ওদের গায়ে ফিনাইল ঢালতে থাকা। ঘর পরিস্কার করার এই সস্তা ফিনাইলগুলো দিয়ে পাগল স্নান করানোর বুদ্ধিটাকে আজ্ঞাবাবুর একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার বলা চলে। এর পিছনে ওনার যুক্তি হল ঃ

১। সাবান দিয়ে স্নান করালে পাগলদের গায়ের ময়লা যায় না। কিন্তু ফিনাইলে যায়।

২। সাবান মাখাবার সময়ে হড়কে গিয়ে পাগলেরা সহজেই পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ফিনাইলে একটু চটচটে ভাব হলেও হড়কে যাবার ভয় থাকে না।

৩। মাখাবার সময়ে হাত ফস্‌কে সাবান পড়ে গেলে পাগলেরা তা তক্ষুণি তুলে খেয়ে ফেলে। কিন্তু বোতল থেকে ঢালা হয় বলে, ফিনাইল অমনভাবে খেতে পারবে না।

৪। সাবানের সুন্দর গন্ধে ওদের মধ্যে মারামারি ধরাধরি চালাবার এবং স্নানে বাধা দেবার নেশা বেড়ে যায়। কিন্তু ফিনাইলের গন্ধে ওরা কেমন অবশ হয়ে পড়ে।

৫। সারা সপ্তাহ ধরে যত জীবাণু ওদের গায়ে মাথায় কিম্বা চুলে দাড়িতে জমে, সাবান তা দূর করতে পারে না। পারে একমাত্র ফিনাইল।

কিন্তু পাগল-আক্রমণের সম্মুখ সমরে দাঁড়িয়ে আজ্ঞাবাবু ভেবে পান না, লাভের খাতায় কী-ই বা হল তাঁর অত দরকারী একটা আবিষ্কার করে?

এইসব মর্কটের পাল অ্যাসিস্ট্যাণ্টরা তাঁর নাম ডুবিয়ে ছাড়ল শেষ পর্যন্ত। ছি ছি! একে তো মগন-ছগন গোয়ালা দুটো অমন পালোয়ান হলেও ভীতুর ডিম। সামান্য ক'টা পাগলের ভয়েই ঠকঠক করে কাঁপে আর রাম নাম নেয়। ওদের পাশে শম্ভু রক্ষিতটার যদিও বা দারুণ সাহস ছিল, কিন্তু ওর আবার কঞ্চির মত চেহারা। একবার একটা পাগলের চিৎকারেই আছাড় খেয়ে পড়ে গেছিল। সুতরাং সেটাও অকেজো। তিনি একা আর কত দিক সামলাবেন?

আজ্ঞাবাবু চিন্তায় চিন্তায় হঠাৎ খুব ক্ষেপে গেলেন। আর তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল শম্ভুর ওপর। কুলাঙ্গারটার গায়ে জোর তো নেই-ই, বুদ্ধিতেও অমন কচুগাছ! আজ ওর একদিন কি আজ্ঞাবাবুর একদিন!

মগনলাল তখন প্রায় শুয়ে পড়েছে। আর ছগনটা ভাইকে ছাড়াবে কি, সেও 'ভেইয়াকে মার দেইলা! ভেইয়াকে খা গেইলা!' করে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। আজ্ঞাবাবুর আবারো মন খারাপ হয়ে গেল। এত চিৎকার চেঁচামেচি শুনলে পাগলেরা আরো পাগল হয়ে যায়, তিনি কি ওদের একশোবার বোঝান নি? হায়, হায়রে। আজ আর একটা পাগলকেও রাখতে পারবেন না তিনি। সবকটা পালাবেই পালাবে। তাঁর এতদিনের স্বপ্ন শেষ করে দেবে। আজ্ঞাবাবু হঠাৎ একটানে নিজের একগোছা চুল ছিঁড়ে ফেলেন। বেশ লেগেছিল চুলগুলো ছেঁড়ার সময়ে। কিন্তু সেই আধ ছেঁড়া চুল নিয়েই সিংহের বাচ্চার মত লাফিয়ে উঠলেন তিনি। উঠে প্রথমেই শম্ভুকে খুঁজতে লাগলেন।

এদিকে, শম্ভু ততক্ষণে তাঁর ছেঁড়া জামা আর ধ্যাধধেড়ে পাজামার ভেতর থেকে সাত হাত সুতোয় বাঁধা মাদুলীটা খুঁজে পেয়েছে। পেয়ে পোয়াটাক ওজনের জং-পরা লোহার বস্তুটাকে সবেমাত্র কাঁপা হাতের মুঠোয় নিয়েছে কি নেয়নি, আজ্ঞাবাবুর তিন-মনি লাথিটা তার কোমরে এসে পড়ল, আর শম্ভুও পরক্ষণেই জেট-প্লেনের মতই উড়ে গিয়ে একেবারে সটান পাগলদের মাঝখানে ল্যাণ্ড করে গেল। মাঝখানে মানে অবশ্য মগনলালের পিঠের ওপর। কারণ

সত্যি বলতে কি, শম্ভুর আগে পাগলদের মাঝখানের জায়গাটা তো তারই ছিল।

চোখের পলকেই এরপর কতগুলো ঘটনা ঘটতে শুরু করল। আজ্ঞাবাবু যার মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে পেলেন না। মগনলাল শুয়ে থাকতে থাকতেই— হঠাৎ শম্ভু তার পিঠে এসে পড়ায়—নিজে মরে গেছে মনে করে এক মড়াকান্না কেঁদে উঠল। আর সেই কান্না শুনে অমন ভীতু যে ছগনলাল, সেও কেমন ক্ষেপে গিয়ে হঠাৎ জয় বজরংবলী বলে এক ডাক ছেড়ে তার হাতের ফিনাইলের বোতলটা দিয়ে পাগলগুলোকে আচ্ছামত পিটতে লাগল।

আজ্ঞাবাবু এই প্রথম দারুণ খুশি হয়ে চেঁচিয়ে বললেন 'সাবাশ ছগন! ছাড়িস না একটাকেও।' কিন্তু তারপরই তাঁর ফিনাইলের বোতলের কথা মনে পড়ে গেল। সর্বনাশ! বোতলটা ভাঙলে যে স্নান করানোই যাবে না ওদের। তিনি ফের পড়ি কি মরি করে চেঁচাতে লাগলেন 'মারিস না, মারিস না ছগন! বোতলটা ভাঙবে, মুখপোড়া গোয়ালা কোথাকার!'

কিন্তু কেবা শোনে কার কথা। পাগলগুলোও মারামারির স্বাদ পেয়ে হলুদ দাঁত বার করে ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ করে ছগনের দিকে ধেয়ে এল আর মগনলাল এর মধ্যেই উঠে, লাল চোখ করে হিন্দীতে কাঁদতে কাঁদতে একটা পাগলের গলা টিপে ধরল। সে এক দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বেধে গেল।

আজ্ঞাবাবু বুঝলেন আজ তার নিস্তার পাওয়া ভার। তিনি পুলিশে না দমকলে ফোন করা উচিত, ভেবে উঠতে না পেরে ঠায় হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখের সামনেই আরো অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ডগুলো ঘটতে লাগল। মগনলাল যে পাগলটার গলা টিপে ধরেছিল, সেটার গলা থেকে ফ্যাঁসু-ফ্যাঁসু করে অবিকল বেড়ালের ডাকের মত একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসতেই আজ্ঞাবাবুর হাত-পা হিম হয়ে এলো। পাগলদের গলা থেকে ওইরকম আওয়াজ বেরুনোটা যে একটা সংকেতবাক্য গোছের ব্যাপার—তা তিনি জানতেন। আসলে অন্য জাত-ভাইদের কাছে সাহায্য চাইছে দম-আটকানো পাগলটা।

ঠিক তাই! দেখতে না দেখতে বেশ কতগুলো পাগলই ছগনলালের সঙ্গে মারামারি থামিয়ে এসে জড় হল মগনলালের সামনে। কিন্তু পাগল হলে কী হবে—এসে গোটা পরিস্থিতিটা দেখে তারা দিব্যি বুঝতে পারল, ভুদোমত লোকটাকে মেরে ধরে ছাড়ানো যাবে না। তাই তখনই তারা একটা অদ্ভুত বুদ্ধি বার করল।

আজ্ঞাবাবু বিস্ময়ে হাঁ হয়ে দেখলেন একটা পাগল টপ্ করে গলা-টেপা খাওয়া পাগলটার পা দুটো ধরে তাকে এক ফুট মত উঁচু করে ধরল। অত লম্বা

চওড়া মগন অবশ্য তাতে একটুও না ঘাবড়ে ওর গলার থেকে হাতে সরালো না। কিন্তু সে তো কিছুক্ষণের জন্য। পা-ধরা পাগলটা ততক্ষণে পা ধরেই আরেকটা পাগলের পিঠে উঠে গেছে। আর সেটাও আরেকটা পাগলের পিঠে। এভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই গলায় আর পায়ে টান খেয়ে মগনলালের ধরা পাগলটা মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে শূন্যে ভাসতে লাগল। তারপর পাগলের পিঠে পাগলের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল, গলা-বন্ধ পাগলটাও ততই তার দাঁড়িয়ে থাকার নিয়ম পাল্টাতে লাগল। মানে, দেখতে দেখতে তার মাথা নীচে—অর্থাৎ মগনের মুঠোয়—আর পা দুটো ওপরে—অর্থাৎ পাগলদের মুঠোয় চলে গেল। মগন তখন আর ঠিক যুৎ করতে পারছিল না। শেষে নীচের পাগলটা আর দুটো পাগলের পিঠে চাপতেই ঝুলন্ত পাগলটা মগনের হাত ফসকে তার মাথার থেকেও আরো দু'ফুট ওপরে চলে গেল আর গলা মুক্ত হয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে শূন্যে ঝোলা অবস্থাতেই মগনলালের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। এদিকে অত তাড়াতাড়ি পুরো ঘটনাটাই সার্কাসের মত ঘটে যাবার পর আজ্ঞাবাবু হাততালি না দিয়ে পারলেন না। শত হোক, পাগলগুলো যখন তাঁর, গর্বও তাঁরই হবে বৈকি?

এদিকে শম্ভু এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি কিম্বা নড়েনি চড়েনি। ছোটবেলায় একটা ভালুকের গল্প পড়া ছিল তার। তাতে দেখেছিল ভালুক কখনো মড়া ছোঁয় না। শম্ভু তাই আশা করছিল, পাগলগুলোও তাকে ছোঁবে না। সত্যিই তাই পাগলগুলো তাকে ছোঁয়নি। শম্ভুর এক কানা পিসী তাকে ভালুকের গল্পটা পড়িয়েছিল। বহুদিন আগেই পিসী মারা গেছে। শম্ভু এখন শুয়ে থাকতে থাকতে, পিসীকে মনে মনে একটা পেন্নাম ঠুকবে, হঠাৎ তার নিজের মাদুলীটার কথা মনে পড়ে গেল। ওহহো! ঐ মাদুলীর গুণেই পাগলগুলো তার কাছে ঘেঁষেনি তবে! পিসীকে আর পেন্নাম না করে শম্ভু শ্মশানডাঙার কাপালিককে একটা প্রণাম করল। তারপর দ্বিগুণ জোরে আবার 'হু র‍্যা র‍্যা' করে এক ডাক ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে গিয়েই টের পেল, লাথির চোটে আজ্ঞাবাবু তার কোমরটাকে মাদুলীর মতই ঢিলে করে দিয়েছেন। ঘরের মারামারিটাও অবশ্য একটু ঢিলে মেরে গেছিল। শম্ভুর ঐ চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা জমে উঠল। আজ্ঞাবাবু শম্ভুকে আবার একটা লাথি মারবেন, ভাবছিলেন। কিন্তু ছগনলালের কাণ্ড দেখে তাঁর বুক শুকিয়ে গেল। হাত পা কাঁপতে লাগল। তিনি নিজের হাতে কী আছে, বেমালুম ভুলে গিয়ে হাতের ইঁদুরের খাঁচাটাকেই 'হায় হায়' করে কপালে ঠুকতে লাগলেন।

ছগনলালকে ভাল চেনা যাচ্ছিল না। তার একদিকের গোঁফ পাগলেরা ছিঁড়ে বা কামড়ে খুলে নিয়েছিল। কপালের সামনের দিকের চুলগুলোও ওদের পাল্লায় শেষ হয়েছে। আর সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হল, তার পরনের ডোরাকাটা আণ্ডার-ওয়ারটা কী এক আশ্চর্য উপায়ে উধাও হয়ে গিয়ে, ওখানে একটা গোলমত ঝুড়ি আটকে আছে, দেখা যাচ্ছে। ভাগ্য ভাল, শুধু হাতের ফিনাইলের বোতলটার জন্যই আজ্ঞাবাবু ওকে আরেকটা পাগল না ভেবে ছগনলাল বলে চিনতে পারলেন। পাগলরা যে ফিনাইল ছোঁয়না, তিনি জানতেন। কিন্তু কী ভাবে যে ছগনলালের অবস্থা ওরকম হতে পারে, তা তাঁর মাথায় ঢুকল না। তাছাড়া ছগনইতো পুরোটা সময় ধরে বাঘের বাচ্চার মত লড়ে গেল। তাহলে তার ঐ অবস্থা হয় কী করে? নাকি, লড়তে লড়তে ছগন ওর এতগুলো অদল-বদলের ব্যাপার ধরতেই পারেনি? বিরক্তিতে আজ্ঞাবাবু সবে 'ধুত্তোরি' বলতে গেছিলেন, তখনই কাণ্ডটা ঘটল। মানে ছগনলাল ঘটাল আর কি! যা দেখে আজ্ঞাবাবুর ঐ হাত-পা কেঁপে বুক শুকিয়ে আসতে আসতে লাগল।

কাণ্ডটা আর কিছু না। পাগলদের সঙ্গে লড়তে লড়তে ছগন হঠাৎ টের পেল, পাগলেরা তাকে একটা ঝুড়ি পরিয়ে দিয়েছে। তবে তাতে করে ছগনের রাগ হওয়া দূরে থাক, তার হঠাৎ কেমন রাম যাত্রার কথা মনে পড়ে গেল। গ্রামের সেসব যাত্রায় ছগন সুগ্রীব সাজত, আর মগন বালী। আহারে, সেইসব সোনার দিনগুলো! আনন্দে ছগন তার একদিকের আধখানা মোচে তা দিয়েই গুনগুন করে একটা দেশোয়ালি গান গাইতে লাগল 'হামারিয়া কি গাঁওমে কিত্না মজা রৈল বা। রাম-রাবনিয়া মেঁ যিত্না যুধ্ হৈল বা।'

আর এই গানটাই ছগনকে তাড়ির কথা মনে পাড়িয়ে দিল। প্রত্যেক রাম-যাত্রার দিন সে আর মগন ভেইয়া তাড়ি খেত। তাড়ির চিন্তাটা ছগনকে যেন আদ্দেকটাই নেশায় ফেলে দিল। সে অবস্থায় ছগন হঠাৎ টের পেল তার হাতে কীসের একটা বোতল রয়েছে না? কীসের বোতল....কীসের বোতল....ছগন কিছুতেই কিছু মনে করতে পারল না। তার একবার মনে হল, মগন ভেইয়া বোধহয় তার হাতে একটা বিলিতী তাড়ির বোতল দিয়েছিল। আহা, বিলিতী তাড়ি! খুশিতে কোমরের ঝুড়িতে একটা থাপপড় দিয়েই ছগন 'হামারিয়া কি গাঁওমে' গাইতে গাইতে লম্বা এক চুমুকে অনেকটা ফিনাইল খেয়ে ফেলল।

আজ্ঞাবাবু সকাল থেকে অনেক কিছু সহ্য করেছিলেন। কিন্তু আর পারলেন না। ভয়ে ওঁর দাঁতকপাটি লেগে যাচ্ছিল প্রায়। ছগনটা মরলে

নির্ঘাৎ পুলিশ টুলিশ আসবে। আর সেই ফাঁকে তার পাগলেরা না বেহাৎ হয়ে যায়। তাছাড়া পাগল যদি আত্মহত্যা করে, তাতে করে আদৌ কোন পুলিশ-কেস্ হওয়া উচিত কিনা, সেটাও তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ কে তাকে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আজ্ঞাবাবু সম্বিত ফিরে পেলেন। দৌড়াতে থাকা লোকটার পেছনটা দেখতে দেখতে উনি মগনলালের টিকিটা শুধু চিনতে পেরেছিলেন। তাতেই বুঝলেন, বিপদ বুঝে মগন কেটে পড়ল। ঘরের মধ্যে ছগনলাল তখন যেখানে সেখানে বমি করছে আর শম্ভু রক্ষিত গলার থেকে ঝোলানো একটা সাতহেতে সুতোয় বাঁধা বেঢপ মাপের মাদুলী মুঠোয় চেপে তার চশমাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। চশমা ছাড়া শম্ভু একেবারে কানা। তাই পায়ের কাছেই পড়ে থাকা চশমাটা তার নজরে না এলেও ঘরের বাইরে থেকে আজ্ঞাবাবু ঠিক দেখলেন, পাগলদের পায়ের চাপে ওটার কাঁচ-টাচ ভেঙে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে আছে। শম্ভুর জন্য যে তাঁর কিছুটা মায়া হচ্ছিল না, তা নয়, তবে কিনা যুদ্ধ জয়ের মুখ করে বেশির ভাগ পাগলই যে-যার জায়গাতে আবার ফিরে গেলেও, তিনি ঠিক দেখেছিলেন, কয়েকটা ত্যাঁদোড় মুক্তিকামী পাগল তাঁর দিকে, মানে পাগলখানার দরজার দিকে ছুটে আসছে।

আজ্ঞাবাবু আর বিন্দুমাত্রও দেরি না করে, গারদে ফের তালা লাগিয়ে দিলেন আর শম্ভুকে চিৎকার করে বলতে লাগলেন 'ঐ যে চশমা ! পায়ের কাছে ! তোল্ তোল্ শিগ্গির।' কিন্তু শম্ভুকে তিনি যত কিছুই বলেন না কেন, শম্ভু ঘুরে ফিরে ঠিক অন্য দিকে খুঁজতে লাগল, আর ছগনলালও সমানেই একটা বিদঘুটে পিত্ত রঙের বমি করতে লাগল।

আজ্ঞাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বুঝলেন, শম্ভুকে চশমা তুলতে বলা বৃথা। কানা গরুর ভিন্ন পথের মত কানা শম্ভুও ভিন্ন পথেই যাবে। তাছাড়া, চশমাটার কাঁচ বলতে তো কিছু নেই। শুধু ডাঁটি দিয়ে কি শম্ভু আর দেখতে পাবে ? ইহজন্মেও পাবেনা। পাগলগুলো এক্ষুনি ওকে পরকালের দরজায় পাঠাল বলে ! অর্থাৎ আজই তাঁর পাগলখানার শেষ দিন। ছগনকে বাঁচানো যাবে না। শম্ভু কেও না।

একটা পিঠে-কুঁজওয়ালা পাগল ততক্ষণে বমির মধ্যেই ছগনের মুখটা চেপে ধরেছে আর ভাঁটার মত চোখ করে গলা ছেড়ে শ্যামা সঙ্গীত গাইছে। আজ্ঞাবাবু শেষবার প্রাণপণে চেঁচালেন 'শম্ভুরে ! চশমা ছাড়াই দেখার চেষ্টা কর্ ! ত্রিনয়নে দ্যাখ ! তোর চতুর্ধারে যমদূত। তোকে আমি নতুন চশমা কিনে দেব বাপ্। আর ঐ সাতটুকরো চশমা খুঁজিস না। ছগনের হাত থেকে ফিনাইলের

বোতলটা নিয়ে ওগুলোকে স্নান করা। ওরা ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

এদিকে আজ্ঞাবাবুর চেনা গলা পেয়ে শম্ভু ঘুরে তাকাতে গিয়েই ছগনলালের গায়ে হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল আর সমস্ত পাগলেরাও অমনি হি-হি করে হাসতে হাসতে তাদের দুজনকে ঘিরে কুঁজওয়ালা পাগলটার শ্যামাসঙ্গীতের সঙ্গে নাচতে থাকল।

আজ্ঞাবাবু আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। কিম্বা দাঁড়াতে সাহস করলেন না বলা যায়। দেড় বছরের ইতিহাসে এত বড় দুর্ঘটনা তাঁর পাগল খানায় আগে কখনো ঘটে নি। উত্তেজনা আর ভয়ে আজ্ঞাবাবুর মাথার চুল দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। দেড়বছরে বোধহয় এই তৃতীয় বার তিনি বাড়ির বাইরে বেরোলেন। আর শুধু বেরোলেনই না ছুটতে শুরু করলেন। অবশ্য আগের দুবারও ছুটতে ছুটতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন তিনি। প্রথমবার একটা পাগল দুটো গরাদের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে আর বেরোতে পারছিলনা বলে। গরাদ কাটার জন্য কামার খুঁজতে গেছিলেন। দ্বিতীয় বার, মানে গতমাসে তার তিনটে পাগল পালিয়ে গেছিল বলে। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর আর গোটা পঞ্চাশ সিনেমা হলে ওদের খুঁজতে গেছিলেন। আর এবারতো সবথেকে সাংঘাতিক অবস্থাতেই চলেছেন। পাগলদের হাত থেকে তাঁর দুটো কাজের লোককে প্রাণে বাঁচাতে। যদিও আজ্ঞাবাবু জানেন, ওদের আর বাঁচানো যাবেনা। ওদের বাড়ির লোকের কাছে প্রমাণ দাখিলের জন্য এখন হাড় ক'গাছা পেলেই হয়।

এদিকে আজ্ঞাবাবু উত্তেজনাতে খেয়ালও করেননি, তিনি তাঁর ঐ পাগল স্নান করানোর পোশাকেই বেরিয়ে এসেছেন। মানে, ল্যাঙোটের মত করে পরা তাঁর ঐ গামছাখানা আর হাতে ঝোলানে পেল্লায় ইঁদুরের খাঁচাটা। সুতরাং সব মিলিয়ে তাঁকে যে কেমন লাগছে, তাঁর আর সেটা জানার উপায়ই ছিল না।

আজ্ঞাবাবুকে দেখামাত্র রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। তিনি তাও টের পেলেন না। বেশ কয়েকটা ভীতু লোক লাফ দিয়ে খানা পেরোতে গিয়ে কাদার মধ্যে পড়ল। তবু সেসব দেখার সময়ও আজ্ঞাবাবুর ছিল না। তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে ইঁদুরের খাঁচাটাকে বাগিয়ে ধরে বাজারের কোণাকুণি একটা রেশন-দোকানে গিয়ে হাজির হলেন। দোকানটায় তখন সকালবেলার ভিড় গিজগিজ করছিল। কিন্তু আজ্ঞাবাবুকে ওভাবে ছুটে যেতে দেখা মাত্রই রেশন নেবার খরিদ্দারেরাও উল্টোমুখে ছুটতে শুরু করল। দেখতে দেখতে দোকানটা ফাঁকা হয়ে গেল। আজ্ঞাবাবু বুঝতে পারলেন না। তিনি দোকানটার ভেতরে

ঢুকে পড়লেন, অথচ তাঁর একটুও মনে পড়ল না কেন তিনি এই দোকানটাতে এসেছেন।

রেশন দোকানের মালিক গজানন মালাকার তখন একটা খাতায় হিসেব পত্র লিখতে লিখতে টাকা গুনছিলেন। তিনি হঠাৎ টের পেলেন, তাঁর কর্মচারী ছোকরা দুটো ঘরের কোণায় রাখা ছাদ-সমান উঁচু চালের বস্তার ওপর চড়ে বসেছে। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝে উঠতে না পেরে তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ওদের দিকে চাইছেন, এমন সময় আজ্ঞাবাবু রে রে করে দোকানের মধ্যে ঢুকে এলেন আর গজাননবাবুও তাড়াতাড়ি টেবিলের তলায় লুকোতে গিয়ে হুড়-মুড়িয়ে একেবারে আজ্ঞাবাবুর পায়ের ওপরে পড়ে গেলেন। আসলে এ পাড়ায় আজ্ঞাবাবুকে ভয় করে না, এমন লোক দুটি নেই। গজাননবাবুর মুখের কাছেই আজ্ঞাবাবুর ইঁদুরের খাঁচাটা ঝুলছিল। তাই তিনি সাত-তাড়াতাড়ি আবার উঠে এসে আজ্ঞাবাবুর পা জড়িয়ে ধরলেন 'আমায় বাঁচান আজ্ঞাবাবু।' শুনে আজ্ঞাবাবু ফোঁস করে একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে বললেন 'কিন্তু আমি এখানে এলাম কেন? সেটাও তো ভাবতে হবে।'

গজাননবাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন 'কেন এসেছেন আজ্ঞাবাবু? আপনার কোন মালপত্র লাগবে কি?'

আজ্ঞাবাবু বললেন 'না। কিন্তু আমার নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে। নইলে আপনার কাছে আসব কেন?'

গজাননবাবু তখন একটু আশ্বস্ত হয়ে একটা গমের বস্তার ওপরে বসে বললেন 'তাহলে আমি বলছি। আপনি মিলিয়ে নিন। আপনার একটা বুনো শেয়াল আছে। সেটার কিছু হয়েছে?'

আজ্ঞাবাবু ঘাড় নাড়লেন 'উঁহু সেটা আমার তৈরি একটা ওষুধ খেয়ে খরগোশের চেয়েও শান্ত হয়ে গেছে।'

গজাননবাবু একটু কেঁপে উঠে বললেন 'তবে আপনার দাঁড়কাক তিনটে? যেগুলোকে একবার আমার দোকানে ছেড়ে দিয়েছিলেন?'

আজ্ঞাবাবু আবারো মাথা নাড়লেন 'উঁহু। খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। কী যেন একটা দরকারি কাজ। কাক তিনটে তো কবেই শেষ হয়ে গেছে।'

'শেষ হয়ে গেছে মানে?' গজাননবাবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেও অবাক না হয়ে পারেন না। 'আহা, আদা-গোলমরিচ দিয়ে দু'ঘণ্টা ধরে রাঁধলে শেষ হবে না?'

দাঁড়কাক রাঁধার কথায় গজানন মালাকার থরথর করে কেঁপে ওঠেন। তারপর কোনরকমে কাঁপা গলাতেই বলেন 'ক্-ক্-কে খেল ওই মাংস? আপনি?'

'উঁহু। আমার পেশেন্টরা।' আজ্ঞাবাবু ভাঁটার মত চোখ করে বলেন 'কিন্তু আমি কেন এসেছি এখানে? কিছুই মনে পড়ছে না আপনার?'

গজাননবাবু ইঁদুরের খাঁচাটা দেখতে দেখতে ভয়ে একটা ঢোঁক গিলে বলেন 'বলছি, বলছি। আচ্ছা, আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ঐ ভবঘুরে ছোকরাটা। ওর কিছু হয়নি তো? শম্ভু না কী যেন নাম—।'

আর বলতে হয় না ওঁকে। আজ্ঞাবাবু ওঁর মাথার ওপরেই ইঁদুরের খাঁচাটা নামিয়ে দিয়ে বলেন 'ফোন! মনে পড়েছে। দমকল অফিসে ফোন করতে এসেছিলাম। নিন, করুন ফোন।'

গজাননবাবু ততক্ষণে মাথার থেকে ইঁদুরের খাঁচাটাকে সরাতে তিনটে ডিগবাজি খেয়ে ফেলেছেন। গায়ের ধুলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন 'আপনার ঘরে কি আগুন লেগেছে আজ্ঞাবাবু?'

'তার থেকেও মারাত্মক!' আজ্ঞাবাবু ওঁর ল্যাঙোটের ওপরকার বেল্টটাকে কষে আঁটতে আঁটতে উত্তেজিত গলায় বলেন 'দুটো খুন হয়ে গেছে বোধহয়।'

'খুন?' গজাননবাবু এবার ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেন 'আপনি করেছেন নাকি আজ্ঞাবাবু? কিন্তু আমি তো কিছু করিনি আপনার—' চোপ! আজ্ঞাবাবু কষে এক ধমক লাগান ওঁকে 'আমি খুন করি না। করলেও বধ করব। আমার পাগলেরা খুন করতে পারে।' গজানন মালাকার ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেন 'কাকে করেছে?'

'কানা শম্ভু আর ছগন গোয়ালাকে।'

'কিন্তু দমকল এসে কী করবে?'

'পাগলদের হাত থেকে ওদের ডেডবডি দুটো বার করবে।'

'ডেডবডি দিয়ে দমকলের কী হবে আজ্ঞাবাবু?'

'নয়তো পাগলেরা ওদের হাড় ইস্তক খেয়ে নেবে। সেটা ভাল হবে?'

'না, তা হবে না। কিন্তু দমকল তো শুধু আগুন নেবায়।'

'আগুন নেবায় মানে?' আজ্ঞাবাবু টেবিলের ওপর ইঁদুরের খাঁচাটাকে ঠুকতে ঠুকতে গর্জে ওঠেন।

'মানে, ইয়ে কোথাও আগুন লাগলেই ওরা আসে যে।' গজাননবাবু ফোঁপাতে থাকেন।

'কুছ পরোয়া নেই। একটা দেশলাই দিন' আজ্ঞাবাবু লাফিয়ে ওঠেন।

'সেকি?' গজানন মালাকার শোনামাত্রই একটা বস্তার ওপর উঠে যান।

'হ্যাঁ। পাগলগুলোর ঘরে আগুন লাগানগে আপনি। আমি দমকল ডাকছি।'

'সর্বনাশ হয়ে যাবে আজ্ঞাবাবু।' গজাননবাবু আরেকটু ওপরের একটা বস্তায় ওঠেন।

'কোথায় পালাচ্ছেন আপনি, অ্যাঁ?' আজ্ঞাবাবু ইঁদুরের খাঁচাটা তুলে নিয়ে এবার একলাফে গজাননবাবুর দিকে এগিয়ে যান। গজাননবাবু অবশ্য ততক্ষণে ছাদের থেকে ঝোলানো কুইন্টালি দাঁড়িপাল্লাটার মাথায় চড়ে বসেছেন, আর তার স্বরে কাঁদছেন। আজ্ঞাবাবু ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলেন না, ওঁকে নামাবেন কীভাবে। হয়ত ইঁদুর দিয়ে পাল্লার দড়ি কাটানোর কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু তার আগেই একটা পরিচিত গলার আওয়াজ শুনে একলাফে রেশন দোকানের বাইরে এসে দেখলেন মগনলাল দুটো তাগড়া যমদূতের মত মোষ নিয়ে ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে। আনন্দে তিনিও লাফাতে লাফাতে মগনের পিছনে ছুটলেন।

মগন এদিকে আজ্ঞাবাবুকে দেখামাত্রই গলা থেকে অবিকল মোষের ডাকের মত একটা আওয়াজ বার করে কেঁদে উঠে বলল 'মেরা ভেইয়া মর গইল্বা বাবু। ও পাগলোঁ নে খা গইল্বা।'

আজ্ঞাবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর ইঁদুরের খাঁচাটা ওপরে তুলে বললেন 'ছি, মগন, রাস্তার মধ্যে কাঁদিস না। দ্যাখ্ দেখি, কী ভুলো মন আমার। ইঁদুরের খাঁচাটা হাতে থাকতেও পাগলগুলোকে অমন ছেড়ে দিলাম? না, না চল্। একটা হেস্তনেস্ত করি দু'জনে মিলে।'

হেস্তনেস্ত-র কথায় মগন একটু শান্তি পায় এবং জানায় যে, মোষ দুটোকে সে শুধু ওই কাজে লাগাবে বলেই নিয়ে এসেছে। আজ্ঞাবাবু আর সে তখন যমরাজের মত দুটো মোষের পিঠে দু'জনে চড়ে বসে। ইঁদুরের খাঁচাটাকে আজ্ঞাবাবু বন্দুকের মত সামনে বাগিয়ে নেন। এদিকে গজানন মালাকার এবং অন্যান্য পাড়ার লোকেরাও ততক্ষণে মোষ দুটোর পিছনে পিছনে লাইন করে বেশ একটু তফাত রেখে এগোচ্ছে। আজ্ঞাবাবু যে আজ কী করবেন, কেউ ভেবে পাচ্ছিল না।

আজ্ঞাবাবুর পাগলা-গারদটা বাড়ির পেছন দিকে। মোষ সমেতই তিনি সেদিকে ধেয়ে গেলেন। মগন একবার মোষ থেকে নামার চেষ্টা করলেও তিনি

ওকে নামতে দিলেন না। তারপর মোষ দুটো সটান যখন পাগলখানার দরজায় পেঁছেছে, তিনি আবার সকাল বেলার মত উজ্জীবিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন 'রেডি, স্টার্ট। মিউজিক অন।' আর মগনও অমনি বিকট রক্ত জমানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল 'হু র‍্যা র‍্যা র‍্যা!'

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! চিৎকারটা শুনে একটা পাগলও 'মার মার' করে দরজার দিকে ছুটে এল না। শুধু একটা নেড়া মত মানুষ কাঁদতে কাঁদতে লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে বলল 'মগন ভেইয়া!' তারপর 'ওহোহো' করে কাঁদতে লাগল। আজ্ঞাবাবু প্রথমটায় ন্যাড়া লোকটাকে চিনতে পারেননি। শেষে যখন চিনলেন ওটা ছগনলাল, মগনও ততক্ষণে 'ভেইয়া' বলে কাঁদতে শুরু করেছে। সে এক ভয়ঙ্কর করুণ দৃশ্য। কিন্তু আজ্ঞাবাবুর কাছে আর কান্নাকাটির সময় ছিলনা। তিনি কোনমতে মোষের পিঠ থেকে উঁকি মেরে ঘরের দৃশ্যটা দেখতে পেলেন। ছগনকে বাদ দিয়ে সবক'টা পাগলই ঘরের এক-কোণে শান্তশিষ্টের মত জড়সড় হয়ে বসে আছে। কিন্তু ওটা কী? ঘরের এককোণে কী একটা পদার্থ যেন বোঁচকার মত পড়ে আছে না?

আজ্ঞাবাবু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে ছগনকে এক রামধমক লাগিয়ে বললেন শম্ভু কাঁহা? ওটা কী পড়ে হ্যায়?' আর ছগন তার উত্তরে যা বলল, তা সত্যিই রোমহর্ষক। শুনে আজ্ঞাবাবুর চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল। শম্ভুর গলার মাদুলীটা নাকি সত্যিই বেশ জবরদস্ত। ওটার জোরেই একটা পাগলও এতক্ষণ তাদের কাছে আসতে পারেনি। শুধু এইমাত্র একটা পাগল দূর থেকে লাফ মেরে শম্ভুর মাদুলীর সাতহাত সুতোর মধ্যে হাত-পা ঢুকিয়ে কী ভাবে শম্ভুর সঙ্গে পেঁচিয়ে গেছে। কিছুতেই তাদের আলাদা করা যাচ্ছে না। এমনকি, দুজনের মধ্যে কার হাত পা, কি মাথা কোন্‌টা-তাও বোঝা যাচ্ছে না?

আজ্ঞাবাবু সব শুনে হাসবেন কি কাঁদবেন, ভেবে পেলেন না। তাঁর আবার রাগে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। দরজার তালাটা খুলে এক মস্ত হুঙ্কারে তিনি পাগলা গারদে ঢুকে গেলেন। পেছনে পেছনে মগনও ঢুকল, তবে হেঁটে আসার ভরসা না থাকায় বাহন সমেতই, অর্থাৎ মোষের পিঠে। তার ভাই ছগনও ঘর খোলা পেয়ে দাদার দেখাদেখি আরেকটা মোষে চেপে বসল।

ওদের দিয়ে আজ্ঞাবাবু প্রথমে মোষের পিঠ থেকেই খুব ভাল করে ফিনাইল ছেটালেন পাগলগুলোর গায়ে মাথায়। যাতে সেগুলো আর বেগড়বাই না করতে পারে। অবশ্য ফিনাইলের গন্ধ পেয়ে ছগন আরো একবার বমি করল, তারপর

একগাল হেসে বলল 'ঠিক হ্যায়।' মানে তার হিন্দুস্থানী চেহারায় সকালের ফিনাইলটা হজম হয়ে গেছে।

পাগলগুলো কিন্তু এবার স্নানের সময়ে বা পরে একটুও গোলমাল করলনা। দানবের মত বড় দুটো মোষকে দেখে তাদের রক্ত হিম হয়ে গিয়ে থাকবে। তাছাড়া মাদুলীর ব্যাপারটা তো ছিলই। আজ্ঞাবাবু ফিনাইল-স্নান করিয়ে তাদের চুল-দাড়ি আঁচড়ে কান ধরে শুইয়ে দিলেন। তারপর ঘরের কোনায় পড়ে থাকা তালগোল পাকানো বস্তাটা মানে শুম্ভ আর নিশুম্ভ-র পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। মাঝখান থেকে আজ্ঞাবাবু রীতিমত হাঁ হয়ে গেলেন। এ্যাকিরে বাবা! লোকদুটো একই জায়গায় আছে বটে, কিন্তু আসলে কে যে কোথায় আছে তাই বোঝা যাচ্ছেনা। এদিকে সকালে শম্ভুকে লাথিটা মারার পর থেকেই আজ্ঞাবাবুর একটা দারুণ বাজে নেশা হয়ে গেছে। ঘন ঘন লাথি মারতে ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর। মারবেন না, মারবেন না করেও ইচ্ছেটাকে চাপতে পারলেন না তিনি। মেঝের ওপর ছিরকুটে পড়ে থাকা লোকদুটোকে, মানে তালগোল পাকানো শরীর দুটোকে একসঙ্গেই একটা লাথি মারলেন তিনি।

আর একই রকম গলায় দু'দুটো কান্নার আওয়াজ শুনে চমকেও উঠলেন। তবে শুধু তিনিই নন। গজানন মালাকার আর পাড়ার আর-সব লোকেরাও মড়ার মত প্রাণীদুটোকে আওয়াজ করতে শুনে কেঁপেই গেছিল। অবশ্য তারা একটা পাঁচিলের ফাঁক থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখছিল বলে, আজ্ঞাবাবু ওদের কথা জানতেও পারলেন না। কিম্বা তাঁর জানার সময় ছিলনা বলা যায়।

ব্যাপারটাকে বহুক্ষণ ধরে দেখে ও শুনে, মাথা ঠান্ডা রেখে তিনি তাঁর ইঁদুরের খাঁচাটা এনে খাঁচা খুলে লোকদুটোর জড়াজড়ি করা দেহের ওপর ছেড়ে দিলেন। তাতে দুটো বীভৎস চিৎকার উঠল বটে, কিন্তু অত করেও চেহারা দুটো একটা একটাকে ছাড়ল না। আজ্ঞাবাবু তখন 'শম্ভু, শম্ভু!' করে বিস্তর হাঁকাডাকি করলেন। লাভের মধ্যে দু'দুটো একই রকম ফ্যাঁসফেঁসে গলায় তিনি 'কর্তা' ডাকটা শুনতে পেলেন। অর্থাৎ দুটোর মধ্যে যেটা পাগল, বাঁচার জন্য সেটা শম্ভুর কথাবার্তা নকল করেছে।

আজ্ঞাবাবুর আর সহ্য হল না। একটা শক্ত পোক্ত ঝুলঝাড়ুনি এনে তিনি মগনকে ডেকে বললেন 'দেখ তো, শম্ভুকে চিনিস নাকি। নয়তো দুটোকেই পেটাব। ওদের আর আলাদা হতে হবে না।'

মগন মোষের পিঠ থেকে নেমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাত হাত মাদুলীর সুতোয়

আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা লোক দুটোকে নানাভাবে টিপেটুপে দেখে যা বলল, তা আরো সাংঘাতিক। মগন বজরংবলীর দিব্যি গেলে বলল দুটো লোকই নাকি শম্ভু রক্ষিত। মানে জোড়া শম্ভু। ওদের একইরকম দাড়ি আর চুল। একই চেহারা। আজ্ঞাবাবু ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন 'সেকিরে, শম্ভু কি এতদিন তবে আমায় ঠকিয়ে এসেছে? ও একটা না, দুটো লোক?'

পায়ের কাছ থেকে একটা গলা বলল 'না কর্তা, আমি একটাই লোক। মাদুলীর সুতোয় জোড়া হয়ে গেছি।' আওয়াজটা তক্ষুনি আরেকটা গলাতেও পাওয়া গেল।

আজ্ঞাবাবু এবার ক্ষেপে গিয়ে এক লাফে ঝুলঝাড়ুনিটা হাতে তুলে বললেন 'নিকুচি করেছে শম্ভুর! আপদ কোথাকার একটা! ওর জোড়া লাগা বার করছি এখুনি'। তারপর ঝাড়নের লাঠির অংশটা দিয়ে মেঝের বিকট পদার্থটাকে গো-বেড়েন দিতে লাগলেন। তবুও রেহাই হল না। 'গেছি গো কর্তা', 'মরেছি কর্তা' বলে দু-দুটো লোকই চেঁচাতে লাগল।

আজ্ঞাবাবু এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন 'মগন, ছগন, তোরা কিছু একটা বুদ্ধি বার কর্। নইলে এদের যে জন্মেও ছাড়ানো যাবে না।'

মগা-ছগা এর জন্য বোধহয় রেডি-ই ছিল। তারা তাদের মোষ দুটোতে চড়ে বসে বলল 'ইস্ দোনো কো উপর সে ভঁইস চড়াইলে সে খুল্ যায়েগা।' শোনামাত্র আজ্ঞাবাবু খুব খুশি হয়ে বললেন 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই কর বাবা। খুলুক ওরা।'

কিন্তু শেষ সময়ে গজানন মালাকার একছুটে পাগল ঘরে এসে চোখ কপালে তুলে বললেন 'সর্বনাশ আজ্ঞাবাবু, মোষ দুটোকে থামান। ওদের পাড়া খেলে, এ ওর পেটে হাত-পা ঢুকে লোক দুটো আরো জড়সড় হয়ে যাবে। তখন কেটে-কুটেও আলাদা করা যাবে না। আপনি বরং মাদুলীর সুতোটাকে কেটে ফেলুন। ওরা বেরিয়ে আসবে।'

গজাননবাবুকে ঘা-কতক লাগাবেন বলে ঝুলঝাড়ুনিটা তুলেও কী মনে হতে আজ্ঞাবাবু আবার ওটা নামিয়ে রাখলেন এবং একগাল হাসলেন। তারপর মোষ দুটোকে ফটাফট দু'চার বাড়ি মেরে ঘর থেকে বার করে শম্ভু রক্ষিতের মাদুলীর দড়িটাকে কেটে দিলেন।

ঘরে তখন এক রুদ্ধশ্বাস দৃশ্য। আজ্ঞাবাবুর সামনে সত্যিই দু-দুটো শম্ভু রক্ষিত মেঝে থেকে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। কোন্‌টা শম্ভু, কোন্‌টা পাগল, বোঝা দায়। আজ্ঞাবাবুর আবার মাথা ঘুরতে লাগল। তিনি হয়ত পড়েও

যেতেন। কিন্তু একটা শম্ভু ছাড়া পেয়েই টলতে টলতে একটা দেয়ালে গুঁতো খেয়ে চশমা খুঁজতে শুরু করায় তিনি তাকে তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে চিনতে পারলেন। আর অন্যটাকে শম্ভুর মাদুলী দিয়ে ভালভাবে বেঁধেছেদে, এক বোতল ফিনাইল চুবিয়ে গারদটায় তালা এঁটে দিলেন।

আজ্ঞাবাবুকে তখন দারুণ খুশি খুশি লাগছিল। শম্ভু আর মগা-ছগাকে দুপাশে নিয়ে তিনি বীরদর্পে পাড়ার লোকদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পাড়ার লোকেরাও সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। গজাননবাবু তক্ষুণি আজ্ঞাবাবুর সম্মানে ওঁরই বারান্দায় একটা সভা বসিয়ে ফেললেন। সেখানে আজ্ঞাবাবু ঐ ল্যাঙোটের ওপর বেল্ট বাঁধা অবস্থায়ই পবন বোস না কে, ভিড়ের মধ্যে ভালমত তার নাম শোনা গেল না,—পাড়ার এক ছোকরা সাংবাদিককে দু'তিনটে ছবি তোলার পোজ দিলেন। আর সেসব পাট মিটতে অবশেষে তাঁর দীর্ঘদিনের পাগল-গবেষণার ওপর বক্তৃতা শুরু করলেন।

তাঁর ভাষণে কী না বললেন তিনি? হাজার রকমের পাগলের বর্ণনা, পাগল বানাবার এবং পাগল ভাল করবার ওষুধ, তাছাড়া সমাজের প্রত্যেক লোকই যে একেক রকমের পাগল বিশেষ—সবকিছুই বললেন। তাঁর ভাষণ শেষ হতে বিকেল গড়িয়ে গেল। মগন আর ছগন তার মধ্যেই বেশ ক'বার তাড়ি খেয়ে এসেছিল। আর আহত শম্ভু আজ্ঞাবাবুর তৈরি 'অচেতনী বটিকা' খেয়ে বারান্দার ওপর চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছিল। আজ্ঞাবাবুর ভাষণ অবশ্য বিকেলেও বন্ধ হত না। আরো অনেকক্ষণ ধরেই চলত। কারণ, সবে তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য 'পাগল আর ধুম পাগল' নামে তাঁর একটা গবেষণা-পত্র পেশ করার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন। এমন সময়ে, পবন বোস না কে, ঐ ছোকরা তাঁকে অত্যন্ত অসঙ্গত এবং খাপছাড়া একটা প্রশ্ন করে জানতে চায় যে, তিনি নিজে কি ওই গবেষণার দ্বিতীয় ভাগ, মানে 'ধুম পাগল' অংশের মধ্যে পড়েন না?

ব্যাস্ অনুষ্ঠান সেখানেই একটা কিম্ভুত-কিমাকার বিশৃঙ্খলার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। আজ্ঞাবাবু প্রশ্নটা শোনামাত্র রাগে পাগল হয়ে গিয়ে পবন বোস না কে—ঐ সাংবাদিক ছোকরার ঘাড়ে সাংঘাতিকভাবে কামড়ে দেন এবং তাতেও শান্ত না হয়ে, পাড়ার সব লোকের ওপর পাগল লেলিয়ে দেবেন বলে তাঁর পাগলা গারদের দিকে ছুটে যান।

আজ্ঞাবাবুর খবর এরপর বিশেষ কিছুই জানা যায় না, কারণ, তাঁর পাড়ার লোকেরা সেই সভা থেকে যেভাবে ছুটে পালিয়েছিল, তা একটা ঐতিহাসিক

দৃষ্টান্ত এবং সেই থেকে পাড়ার লোকেরা আর কেউই তাঁর বাড়ির ত্রিসীমানা দিয়ে হাঁটে না।

শুধু দুটো ব্যাপার ঠিকঠাক বলা যায়। এক ঃ আজ্ঞাবাবুর পাড়ার দোকানীরা কোন শুক্রবারেই দোকানপাট খোলে না এবং কেন খোলে না, সে বিষয়ে কখনো মুখও খোলে না। দুই ঃ পবন বোস না কী বোস, আজ্ঞাবাবুর কামড় খাওয়া সেই সাংবাদিক ছোকরা সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। ধুম পাগল-ই বলা যায়। সাংবাদিকতা ছেড়ে সে এখন মানুষ পাগল করা গপ্পো লেখে আর সম্পাদকদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। তবে, সেসব ব্যাপার নিশ্চয়ই এ গল্পের বাইরেই হবে।

তন্ময় চট্টোপাধ্যায়

ম্যাচ্‌টা হলনা

রিঙ্কু পার্কে পেঁছে দেখল, ভোঁ ভোঁ। কেউই আসেনি। অথচ পিলু, পানু, লুপু—ওদের সবারই আসার কথা। কদিন বাদেই ইয়ং ক্লাবের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ। অথচ সবাই হাওয়া। রিংকু একবার বসল, আবার উঠল, তারপর ভাবতে লাগল, ওরা বোকা বানালো নাকি? ঠিক যেমন ও একবার বিশ্রি রকম বোকা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। তেমন নয়তো?

পুরোনো ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়।

সেদিন সকালে রিঙ্কুর মা কী একটা দরকারে ওকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন। বাজারের কাছে মাংসের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে রিঙ্কু দেখল নণ্টেদা একটা পা মাটিতে ঠেকিয়ে সাইকেলের সিটের ওপর বসে মিটিমিটি হাসছে। ওকে দেখেই ডাক দিল ঃ

—এই রিঙ্কু শোন্।

—কী বলছ নণ্টেদা?

—বলি রেলের মাঠে দারুণ সার্কাস এসেছে, দেখেছিস?

—না। বাবা পয়সাই দিচ্ছে না, তো দেখবো কোত্থেকে?

—দূর বোকা, সার্কাস দেখবি—তাতে পয়সা লাগবে কেন?

—বাঃ, এমনি ঢুকতে দেবে নাকি?

—পাশ নিয়ে ঢুকবি।

—পাশ কোত্থেকে পাব। তুমি দেবে?

—থাকলে নিশ্চয়ই দিতাম। কিন্তু আমার কাছে নেই। তুই বরং এক কাজ কর। ফটকেকে চিনিসতো? ওই যে ফটকে বাজার করতে ঢুকলো।

—চিনি না মানে? খুব চিনি। মুখুজ্যে পাড়ায় থাকে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ও-ই সার্কাসের পাশ দিতে পারে। চেয়ে নে একটা।

—ও কোত্থেকে পাশ দেবে?

—সেকি, ও যে সার্কাসে শিম্পাঞ্জী সাজে জানিস না! ওটাই তো ওর কাজ। দেখছিস না কেমন শিম্পাঞ্জীর মত চেহারাখানা! তবে মনটা খুব ভাল রে।

—যাঃ তাই কখনো হয় নাকি? সার্কাসে তো সত্যিকারের শিম্পাঞ্জীই থাকে।

—তোর মাথা। দূর থেকে দেখিস বলে বুঝতে পারিস না। ওসব নকল দিয়েই চালাতে হয়। যা, যা, ফটকে এক্ষুনি চলে যাবে। ওর থেকে গিয়ে চেয়ে নে।

—কিন্তু যদি বকে?

—সেকি, বকবে কেন? ও তো অনেককেই পাশ দিচ্ছে।

—সরল বিশ্বাসে রিংকু গিয়ে ফটকেদার পিছনে দাঁড়িয়েছিল। ফটকেদা তখন সবে 'ঝাল কি না' পরীক্ষার জন্য কচ্‌মচ্‌ করে একটা গোটা কাঁচা লংকা চিবিয়ে খেয়ে লাল চোখে অন্য দোকানদারের কাছে লংকা খুঁজতে যাচ্ছে। মানে চোখমুখ লাল করা এই লংকাটাও তার কাছে 'তেমন ঝাল' লাগেনি।

রিংকু তখনই লোভীর মত গিয়ে বলল—ফটকেদা, একটা পাশ দাওনা?

—পাশ মানে? ফটকেদার চোখ আরো লাল দেখায়।

—সার্কাসের পাশ।

পাশের আশায় রিংকুর চোখও চক্‌চক্‌ করছিল।

—আমি কোত্থেকে পাব?

ফটকেদা যেন একটা কাঁচালংকার মতই তাকে লক্ষ্য করে।

—বাঃ তুমি তো সার্কাসে শিম্পাঞ্জী সাজো। পাশ দিতে পারো না একটা?

একটা সেকেণ্ড বোধহয় কেটেছিল। কিম্বা তারও পাঁচ-ছ'ভাগের এক ভাগ। তার মধ্যেই নিজের মুখের কাঁচা লংকার ঝালটাকে ফটকেদা যেন মন্ত্র বলেই রিংকুর মুখে মাখিয়ে দিলেন। অবশ্য ঠিক মন্ত্র নয়। বিরাশি সিক্কার চড়খানা তার গালে বরং যন্ত্রের মতই আটকে গেল বলা যায়। রিংকু সেই চড়ের গুঁতোয় চার হাত-পা ছড়িয়ে, লাটিমের মত বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে

বাজারের পচা আনাজ, তরকারির খোসা—এইসব ফেলার একটা নোংরা গর্তে চিৎপাত হয়ে পড়েছিল। আর ওভাবে পড়ে থাকতে থাকতেই ভয়ে, আর অপমানে তারপর তারস্বরে কান্না জুড়েছিল।

ফটকেদা কিন্তু ভাল করে কাঁদতেও দিল না তাকে। এক ঝটকায় ফের তাকে দু'পায়ের ওপর খাড়া করে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—বেয়াদপ, ছুঁচো কোথাকার! ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে বড়দের সঙ্গে চ্যাংড়ামি করতে এসেছ! চলো, তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাব!

বাবার নাম শুনেই রিঙ্কু ভয়ে আরো জোরে কাঁদতে কাঁদতে নণ্টে-বৃত্তান্তটা পুরো খুলে বলেছিল। নণ্টেদা কীভাবে তাকে সার্কাসের পাশের কথা বলে পাঠিয়েছে—তার আপাদমস্তক খবর। শুনে মস্ত একটা পাকা লঙ্কার মত লাল মুখ করে—ও! এটা ঐ হাড়গিলে নণ্টের কাজ!—বলেই ফটকেদা তাঁকে ছেড়ে নণ্টেদার দিকে ছুটেছিল। কিন্তু তাকে আর পেলে তো! রিঙ্কুর দিকে ফিরে খ্যাঁক খ্যাঁক করে গা-জ্বালানো হাসি হাসতে হাসতে সড়াৎ করে সে সাইকেল নিয়ে লম্বা দিয়েছে। মাঝখান থেকে বোম্বাই আমের মত ফুলে ওঠা মুখ নিয়ে দেরিতে বাড়ি ফেরার জন্য বাবার কাছেও একটা কানমলা খেতে হয়েছিল তাকে।

পার্কে বসে নণ্টেদার তাকে বোকা বানানোর সেই পুরোনো ব্যাপারটা মনে পড়ে যেতে আরেকটু হলেই রিঙ্কুর কান্না এসে যেত। কিন্তু পানুকে আসতে দেখেই কান্নাটা বেরোতে গিয়েও ঠিক বেরোল না। বরং একটা রাগ-রাগ ভাব বেরিয়ে এল। রিঙ্কু বেশ বিরক্ত মুখেই পানুকে জিজ্ঞেস করল ঃ

—কিরে, তোদের দেখাই নেই যে, ইয়ং ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচটার ডেট ফিক্স্ করতে হবে। এদিকে এখনো টিমই হলো না আমাদের। কোথায় ছিলি তুই?

—আর বলিস না।—পানু প্রায় ধপাস্ করেই তার পাশে বসে পড়ে—স্কুলের ওয়ার্ক এডুকেশন নিয়ে একটা ফাঁড়া যাচ্ছে বলতে পারিস।

—কি হয়েছে ওয়ার্ক এডুকেশন নিয়ে?

—আরে, বলে কিনা খাতায় তিতির পাখির পালক সেঁটে আনতে হবে। এখন কোথায় পাই তিতির পাখি? আর পেলেও সেটা ওর পালক নিতে দেবে কিনা কে জানে? তাই মাথা খাটিয়ে করলাম কি, একটা ভারী ঝগড়াটে চড়াইকে তাড়িয়ে নিয়ে কোনমতে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। পাখি তো ঘরে ঢুকল। এবার দরকার ওকে নামিয়ে আনা। তার জন্যও বুদ্ধি করে

নিলাম মায়ের একটা বিষম ঢ্যাঙা ঝুল-ঝাড়ুনি। ব্যাস্, শুরু হল বেদম এক চোর-পুলিশ খেলা। এদিকে তাড়াই তো ওদিকে যায়। এ দেয়ালে মারি তো, ও দেয়ালে বসে। একবার ওপরে, একবার নীচে। কিছুতেই আর ম্যানেজ করতে পারি না। এদিকে ঝুল-ঝাড়ুনির নানা ড্রাইভে ঘরের হাজারো জিনিস-পত্র ভেঙেচুরে উল্টে-পাল্টে তছনছ। এমনকি একবার তো ঢ্যাঙা ঝাড়ুনির গোড়ায় লেগে কাপড়ের আলনাটাই পড়ল উল্টে। ঘর একেবারে লণ্ডভণ্ড। শেষে আর কোন উপায় না দেখে ঘরের সিলিং ফ্যানটাই চালিয়ে দিলাম। ওর পাখায় লেগে পাখির কেরামতি যদি শেষ হয়।

—পারলি ফ্যান চালিয়ে ধরতে ?

—উঁহু অত সহজে নয়। শোনই না। পাখীটা ফ্যান এড়িয়েও সমানে উড়তে লাগল। তখন ক্ষেপে গিয়ে ঢ্যাঙা ঝুল-ঝাড়ুনিটা দিয়ে যেই না—ফ্যানের ব্লেডে খটাং। ঝুল-ঝাড়াটাও পটাং! বেশ জমে উঠেছিল আর কি। কিন্তু তার আগেই দরজা খুলে মা ঘরে ঢুকেই আমার পিঠে একেবারে উত্তম-মধ্যম। তাও যদি বা শেষ হল, শেষ রক্ষা হল না।

—পাখীটা পালালো নাকি !

—নারে। উড়তে উড়তে হাঁফিয়ে গিয়ে ওটা আমার বিছানার ওপরেই বসেছিল। কিন্তু ওর পালক খাতায় সেঁটে ওয়ার্ক এডুকেশনের ক্লাশে যেই না নিয়ে গেছি—স্যারও অমনি ওটা চড়াই পাখির পালক বলে ধরে ফেলল আর আঙুলের ফাঁকে পেন্সিল ঢুকিয়ে বারোটা বাজাল আমার হাতের।—ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে পানু চুপ করল।

রিঙ্কু কিছুক্ষণ ভেবেটেবে বলল—তা হলে কী হবে ?

পানু বলল—আমার তো এই অবস্থা। এদিকে পিলুর খবর জানিস ?

কেন পিলুর আবার কী হল ?

—আর বলিস না। সেও এক কাণ্ড। পিলুর বাড়ি গিয়ে শুনি, আজ সকাল থেকেই নাকি ওর পাত্তা নেই। প্রথমে তো ভড়কেই গেছলাম। শেষে অনেক খুঁজে বিলের মাঠে গিয়ে দেখি এক কোণে উপুড় হয়ে ও কী খুঁজছে। পিলু, পিলু বলে বার কয়েক ডাকলাম। কিন্তু ও কিছুই শুনতেই পেল না। যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে মনে হল। তারপর একসময় মুখ তুলে, কেমন ঘোলাটে চোখে আমাকে দেখে বিড়বিড় করে বলল 'আগে বিহারীরা এখানে ওদের খাঁচায় পুরতো। ঠোঁটে গা চুলকাতে চুলকাতে কত পালক ফেলত ওগুলো।' এইসব বলছে আর যত রাজ্যের ঠোঙা কি শালপাতা উল্টে পাল্টে

দেখছে পিল্টু। 'কী খুঁজছিস রে?' আমি জিজ্ঞেস করতে ও এবার সম্বিত পেয়ে বলল 'তিতির পাখির পালক। এখানে পেলাম না। এবার দক্ষিণ-পাড়ার মাঠে যেতে হবে।'

—তারপর ও গেল নাকি দক্ষিণ পাড়ায়?

—তবে আর বলছি কী! ওই ঘোরের মধ্যে সেই যে গেল, এখনো তো ফেরেনি।

—যাঃ, তবে আমাদের ইনিংস ওপেন করবে কে?—রিঙ্কু প্রায় কেঁদে ওঠে।

পানু এর জবাবে কী বলবে ভেবে পায় না। তাছাড়া ও মুখ খোলার আগেই লুপু এসে পৌঁছে গেছিল পার্কে। লুপু ওদের দলের এক নম্বর স্পিনার। ওকে আসতে দেখে বাকি দু'জনেরই মুখ-চোখে আশার আলো ফোটে। অবশ্য লুপু আরেকটু কাছে আসতেই ওকে খোঁড়াতে দেখে চোখ কপালে তুলতে হয়। তাছাড়া মাথাতেও হলদে মত কী লাগিয়ে এসেছে ও।

—কিরে, এত দেরি করলি? খোঁড়াচ্ছিস কেন?—পানু আর রিঙ্কু প্রায় একসঙ্গেই বলে ওঠে। লুপু ওদের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এবার একটা পা তুলে দেখায়। অনেকখানি জায়গা কেটে হাঁ হয়ে আছে। পা-টা নামিয়ে লুপু বলল—ঘোড়া-ডাঙায় খোঁড়া।

—তার মানে?—ওরা একেবারে হাবার মত বলে।

—মানে নেচার-স্টাডির শাস্তি। ঘোড়াডাঙায় ছোট পিসীর বাড়িতে মস্ত বাগান আর বিরাট পুকুর আছে। বাগান থেকে অ্যারিকা পামের পাতা, বোগেনভেলিয়ার ফুল, গোলঞ্চ গাছের ছাল। লাল কচুর ডাঁটা আর ঘোড়ানিমের ফল; পুকুর থেকে চুনোপুঁটি আর মৌরলা মাছের আঁশ যোগাড় করতে তাই পিসীর ওখানে যেতে হল।

—কিন্তু তার সঙ্গে পা কাটার কী সম্পর্ক? —রিঙ্কু না বলে পারে না।

সম্পর্ক মানে জবর সম্পর্ক। মাছের আঁশ খুঁজতে পুকুরে নেমেই তো পচা শামুকে পা কাটল। আর অ্যারিকা পামের ঝাড় থেকে ভিমরুল বেরিয়ে হুল বসালো মাথায়। ব্যাথায় বোধহয় আর বাঁচব না রে।—লুপু কাতরাতে কাতরাতে কথা থামায়।

অবস্থা দেখে রিঙ্কু আকাশের দিকে তাকাল। হয়ত ভগবানকে দেখা যায় কিনা খুঁজতেই। ম্যাচটার অবস্থা একেবারে বে-হাল হয়ে গেল। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—টিম করাই মুশকিল হয়ে যাবে দেখছি।

চ' একবার চরণের বাড়ি যাই। ও কেমন আছে কে জানে।

পথে বিরুর সঙ্গে দেখা। কেউ কোন প্রশ্ন করার আগেই বিরু বলে উঠল—তোরা টিম করলে ভাই আমাকে বাদ দিয়ে রাখিস।

—কেন? কেন?—তিনজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

—কেন নয় বল? মেজদার কাছে আড়ং ধোলাই খেয়ে কাল ডান হাতের কড়ে আঙুলটা বোধহয় ভেঙেই গেছে।

—সেকিরে, মার খেলি কেন হঠাৎ? পয়সা সরিয়েছিলি বুঝি?

—দূর, সেসব নয়। ঐ হতচ্ছাড়া 'ওয়ার্ক' এডুকেশন' ক্লাশে কলিং বেল বানিয়ে আনার হুকুম ছিল। ওসব কি ছাই পারি? তা মেজদা রেডিও সারায়। চেপেচুপে ধরতে একটা কলিং বেল বানিয়ে দিতে রাজীও হল। তবে তার জন্য নানান ফরমায়েশ। টিন, তার, পেরেক, স্প্রিং—সব খুঁজে আনতে হল। তারপর কয়েক ঘণ্টা বাদে সত্যিই হলও একটা যন্ত্র। বেড়ে হল বলতে পারিস। সুইচ টিপলে হ্যামারটা অনেকক্ষণ তিরতির করে নড়ে। কিন্তু মুশকিল হল একটাই। মেটাল-কভার নেই বলে আওয়াজ হয় না। যন্ত্রটা ওরকম আধখ্যাঁচড়া অবস্থায় রেখেই মেজদা কোথায় বেরিয়ে গেল। আর যাবার আগে বলে গেল, বিকেলে সাইকেলের দোকান থেকে একটা বাটি এনে দেবে।

তা, মেজদা সাইকেলের দোকানে বাটি পাবে কি না পাবে ভেবে দুপুরে আমি সামান্য একটা হাতসাফাই করে বসলাম। রান্নাঘর থেকে ছোট একটা স্টেনলেস্ স্টিলের বাটি নিয়ে, তাতে পেরেক ঠুকে ফুটো করে যন্ত্রটার সঙ্গে লাগিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপর সুইচ অন্ করেছি কি করিনি—রিং রিং করে পেল্লায় আওয়াজে বাড়ি মাথায় উঠল আর মেজদাও সেই মুহূর্তেই ঘটোৎকচের মত বাড়ি ঢুকেই আমায় ঘরের জিনিস গোল্লায় দিতে দেখে—আমার পিঠে কী ঘণ্টাটাই যে বাজল, তা তো বুঝতেই পারছিস। তাও হয়তো খেলতে পারতাম—কিন্তু আঙুলটা চোট হয়েই সে গুড়ে বালি পড়েছে।

মন খারাপ নিয়ে কেউই আর কথা বলতে পারল না রাস্তায়। সত্যিই, ওয়ার্ক এডুকেশনের গেরো লেগেছে যেন তাদের ক্রিকেট ম্যাচের কপালে। আশা-ভরসা সব নির্মূল। এর মধ্যে কখন চরণদের বাড়ি এসে গেছিল। ওরা মনমরা গলায় ওকে ডাকতে লাগল। চরণ দলের ক্যাপ্টেন। ও জোর দিলে এখনো খেলা হতে পারে।

কিন্তু চরণকে দেখেই বুক শুকিয়ে গেল সবার। জ্বরে কোঁ কোঁ করছে তাদের ক্যাপ্টেন। অল্প কথায় অসুস্থ চরণ যা বলল, তার সারমর্মও সেই

ওয়ার্ক এড়ুকেশানের গেরোকেই আরো শক্ত করল। অর্থাৎ সেই একই পাখির পালকের ঝামেলা। ওর বেলায় আবার টিয়া পাখির পালক। খাঁচায় টিয়া নিয়ে বসা জ্যোতিষী ভজন সিংয়ের কাছে হাত দেখাবার ভান করে গিয়ে যেই না পাখিটার একটা লেজের-পালকে টান মেরেছে—হতচ্ছাড়া পাখি অমনি তার হাতে মেরেছে ঠোকর। রক্ত-টক্ত বেরিয়ে সে এক বিদিকিচ্ছিরী কাণ্ড। তার ওপর ভজন সিং-ও চরণকে 'শ্রীচরণে-সু' বানিয়ে ওর মায়ের কাছে টানতে টানতে এনে নগদ দুটো টাকা ক্ষতিপূরণ নিয়ে গেছে।

—কিন্তু এত করেও যদি হতো—চরণ গোঁ গোঁ করে বলল—শেষমেষ উপায় না দেখে সাদা পায়রার পালকে সবুজ রঙ করে নিয়ে গেছিলাম স্কুলে। আর মাস্টারমশাই তা ধরতে পেরেই রাগে মারতে মারতে আমাকে ঢিলে বানিয়ে শেষে রোদ্দুরের মধ্যে স্কুলের উঠোনে অষ্টাবক্র সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর আর কী? স্কুল থেকে ফিরেই বাধল জ্বর। কবে যে ছাড়বে, কে জানে? তোরা বরং আমার আশা বাদ দে—

শুধু চরণের আশাই নয়, ওরা তখন গোটা খেলার আশাটাই বাদ দিয়েছে। তবু দলের একজনকে এখনো খোঁজ করা বাকি রয়ে গেছে দেখে, সবাই মিলে ঠিক করল, তার বাড়িতেও যাবে। তারপর যা হয়, একটা কোন ডিসিশান ভেবে দেখা যাবে। সেই 'একজন' অর্থাৎ নীপুর কথা রাস্তায় ওরা অনেক আলোচনাও করল। চরণের পর তাদের মধ্যে নীপুই সবচেয়ে ভাল ফর্মে আছে, তাছাড়া ক্যাপটেনসিও ভাল বোঝে ও। সুতরাং রাস্তায় যেতে যেতেই ক্লাবের চার সদস্যের মধ্যে একটা মিটিং হয়ে গেল আর তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, চরণের বদলে নীপু যদি এবার ক্যাপটেন হতে রাজী হয়, তবে চোট-আঘাত নিয়েও একটা ভাঙাচোরা দল নামাবে ওরা।

নীপুর বাড়ি এসে গেছিল। দরজার কড়া নেড়ে চারজনই ব্যাগ্র চোখে তাকাল। কিন্তু নীপু নয়, দরজা খুলল তার বোন নিভা। নীপুকে খুঁজছে শুনে ছোটখাট স্পষ্ট উত্তর তার—দাদার পা ভেঙেছে। উত্তরটা যেন হুবহু একটা বোমার মতই ফাটল। আর ততক্ষণে অন্য কিছু না জিজ্ঞেস করেই ওরা হুড়মুড় করে নীপুর ঘরে ঢুকে পড়েছে।

ঘরে কাঁদো কাঁদো মুখে দরজার পাশের একটা খাটে শুয়ে ছিল নীপু। পায়ে ইয়াব্বড় প্লাস্টার চকচক করছে। ওদের দেখেই হায় হায় করে ওঠার মত বলল—এই শীতকালের খেলা বোধহয় আমার শেষ হয়ে গেল রে।

একের পর এক বিদ্ঘুটে সব দুর্ঘটনা দেখতে দেখতে কারুরই আর কিছু বলার ছিল না তেমন। তবু রিঙকু ফ্যাসফেসে গলায় জানতে চাইল—'কী করে হল এসব ?

নীপু কেঁদে ফেলার মত আওয়াজে বলল—ওয়ার্ক এডুকেশনের ঠেলা।

—অ্যাঁ, আবার ওই ব্যাপার ?

—মানে ?—প্রশ্নটার মাথামুণ্ডু কিছু ধরতে পারে না নীপু।

—না, কিছু না। তুই বল্। রিঙকু একটা লম্বা শ্বাস ছাড়তে গিয়েও চেপে যায়।

—বলব কী ভাই, আমার তো যা হবার তাই হয়ে গেল। নীপু ঘোঁত-ঘোঁত করতে করতে বলে—ওয়ার্ক এডুকেশানের ক্লাসে আমার ওপর ভার পড়েছিল একটা সাণ্টাক্লজ বানানোর। ঐ বড়দিনের আগে সাহেবরা যে ভাল বুড়োর পুতুল বানায়, সেটা। পাউডারের কৌটা, চুলের ফিতে, পুরোনো লাল জামা—এসব দিয়ে বেশ তৈরিও করেছিলাম একটা। কিন্তু গোল বাধল সাণ্টাক্লজের চুল দাড়ি বানানোর জন্য তুলো যোগাড় করতে গিয়ে। তুলো পাব কোথায় ? শেষে অনেক ভেবেচিন্তে ছোট কাকার ঘর থেকে একটা বালিশ সরিয়ে, সেটাকেই ছিঁড়ে ফর্দাফাই করলাম। ছোট কাকা কদিন হল টাটানগরে বেড়াতে গেছিল। বিশ্বাস কর, বড়দিন-বুড়োর চুলদাড়িও বেশ ভালই হল। কিন্তু কাজটা পুরোপুরি শেষ হবার আগেই পিঠের ওপর পড়ল এক গদাইলস্করী লাথি। ছিটকে পড়ে চেয়ে দেখি—হায় ভগবান দরজার গোড়ায় ছোটকাকাই যে মূর্তিমান যমের মতন দাঁড়িয়ে। কপাল খারাপ হলে যা হয়। অনেক আগে ভাগেই ফিরে এসেছে কাকা। তারপর আর কী ? সাণ্টাক্লজ তো গেলই—পিঠ বাঁচানোর জন্য তড়িঘড়ি ছুটে পালাতে গিয়ে পাপোসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমার এই অবস্থা হল। পরে কাকাই অবশ্য হাসপাতালে নিয়ে গেছিল, কিন্তু মাঝের থেকে আমার এই সিজনে খেলা-টেলা সব গেল। যাক্, আমার কথা থাক। তোদের ক্রিকেট ম্যাচটার কী অবস্থা বল্ এবার।

নাঃ ক্রিকেট ম্যাচটা আর হল না। রিঙ্কু, পানু, লুপু আর বিরু সেই বিকেলে আবার পার্কটাতে ফিরে এসে ডিসিশান নিল খেলোয়াড়েরা প্লেইং কণ্ডিশানে নেই বলে ইয়াং ক্লাবকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেবে। ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যেতে, যে যার মত বাড়ি চলে যাচ্ছে—রিঙ্কু হঠাৎ একগাল হেসে বলল—দ্যাখ্, অত মন খারাপ করিসনা। ক্রিকেট ম্যাচটা হলনা বটে কিন্তু খেলা তো একটা হয়েছেই !

বাকি তিনজন একসঙ্গেই হাঁ হাঁ করে উঠল—মানে ?

—ওয়ার্ক এডুকেশনে—রিংকু রহস্যমাখা মুখে জানায়—ভেবে দেখলাম, শুধু ক্রিকেট কেন, দুনিয়ার সব খেলার থেকেই কঠিন খেলা হল এটা। খেলোয়াড়দের জান নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি পড়ে যায়।

প্রায় একসঙ্গে ওঠা চাররকম চারটে হাসির আওয়াজে পার্কের বিকেলটা হঠাৎই খুব গমগম করে উঠল ॥

শিবতোষ ঘোষ

স্বর্গদ্বার

ষ্টেশনে যমদূত এসে হাজির হল নিতাইদা'র সামনে। নিতাইদা'কে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম নিতাই বর্কাস ?"

নিতাইদা বলল, "হ্যাঁ।"

"তুমি গোপালপুর থেকে আসছ ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাবার নাম বৃন্দাবন বর্কাস ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! গলায় মোটা মালা ছিল, শোবার আগে রোজ হরিনাম জপ করত। আর কিছু বলতে হবে ?"

যমদূত বলল, "না, চলো !"

"কোথায় ?"

"কোথায় মানে! তুমি বুঝতে পারছ না ? আঁকুপাকু হচ্ছে না তোমার ভেতরটা ? নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না ?"

"সে তো সব-সময়ই হয়।"

"তোমার পরলোকে যাবার নোটিস আছে, এই দ্যাখো, চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিট গতে...."

“বাঃ আমার চারটে চল্লিশে ট্রেন !”

“তোমার গাড়ি ঘোড়ায় আর দরকার নেই, চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটে তোমার মৃত্যু। চিত্রগুপ্ত একেবারে লাল কালিতে দাগ মেরে নোটিস ছেড়েছে।”

বলেই যমদূত লাল দাগ-দেওয়া জায়গাটা পড়তে লাগল, “শ্রীনিতাই বকসি, পিতা স্বর্গত বৃন্দাবন বকসি, নিবাস....”

নিতাইদা প্রচণ্ড ধমক দিল, “চুপ করো, আমি পয়সা গুনছি ! আজকাল খুচরোর খুব অভাব চলছে, ঠিক-ঠিক খুচরো না দিলে টিকিট দেবে না !”

“কী মুশকিল, তোমার পয়সা গুনে কী হবে, তুমি যাচ্ছ যমপুরীতে, সেখানে তোমার সঙ্গে পয়সাও যাবে না, টিকিটও লাগবে না !”

নিতাইদা যমদূতের ওপর রেগে গেল, “মামা বাড়ি আর কি ! আমি গরমে ঘেমে-নেয়ে আধ ঘণ্টা ধরে লাইন দিলাম, এখন বলছ টিকিট কাটব না। তা হলে আধ ঘণ্টা আগে বললেই পারতে !”

“তখন তুমি বলতে ট্রামে-বাসে চিড়ে-চেপটা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে এসেছি, আমাকে বাসে ওঠার আগে বলতে পারতে।”

নিতাইদা বলল, “বলবই তো, একশোবার বলব ! সময় থেকে জানলে কোনও নিরালা জায়গায় বসে শেষ সময় একটু হরিনাম করে নিতাম !”

যমদূত হেসে বলল, “সেজন্যই তো এলাম ! এখানে এত কষ্ট করে লাভ কী ? চলো, আমার সঙ্গে চলো, সেখানে নিরালা জায়গাও পাবে, অঢেল সময় পাবে, যত খুশি হরিনাম করতে পারবে !”

নিতাইদা বলল, “লক্ষ্মী ভাইটি, সময় যখন আছে তখন একটু দাঁড়াও ফোকরে হাত ঢুকিয়েছি, টিকিটটা কেটে নি ! যাওয়া না হলে অন্যভাবে চালিয়ে দেব, টিফিন-খরচটা তো উঠে আসবে, যা খিদে পাচ্ছে !”

নিতাইদা চিৎকার করল, “কী দাদা, কী করছেন ? তাড়াতাড়ি হাত চালান !”

যমদূত বলল, “দেখো, তখন যেন বোলো না, এত কষ্ট করে যখন টিকিট কাটলাম, তখন ট্রেনে চড়ি, যখন ট্রেনে হুড়োহুড়ি করে উঠেছি তখন বাড়ি যাই ! আর তোমাদের বাড়ি যাওয়া মানে তো দেড় ঘণ্টার ট্রেনে দু'ঘণ্টা লেট।”

নিতাইদা তাড়াতাড়ি বলল, “না-না, অত লেট সব মেল এক্সপ্রেসে হয়, আমার তো লোক্যাল ট্রেন, এতে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের বেশি লেট হয় না।”

নিতাইদা কিন্তু মনে-মনে ঠিক করল, বাড়ি যদি একবার কোনওরকমে যেতে পারি, তা হলে আমাকে আর পায় কে ! অন্তত হাত-পা ধুয়ে, খাওয়াদাওয়া সেরে... , নিতাইদা দু কিলো হিমসাগর আম কিনেছে, আম দিয়ে ভাত মেখে

খেতে তার যে কী ভাল লাগে!

হঠাৎ তার একটা বুদ্ধি এসে গেল মাথায়, সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পটা মনে পড়ে গেল। সে তার স্ত্রী কাঞ্চনবালাকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে, আরে সাবিত্রী একটা অজ গাঁয়ের মেয়ে, তখনকার দিনে কীই-বা এমন লেখাপড়া জানত, কাঞ্চনবালা বরং ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে, আর যা ঝগড়ুটে....

কাঞ্চনবালা যমরাজের সঙ্গে কী-কী পয়েন্টে তর্ক করবে মনে মনে একবার আওড়ে নেয়।

"আমার শাঁখা-সিঁদুর যেন অক্ষয় থাকে!"

"তথাস্তু!"

"স্বামী মারা গেলে ওগুলো অক্ষয় থাকে কী করে?"

হিহি হাসল নিতাইদা, ওদের হারাতে কী!

যমদূত ঝাঁকুনি দিতে সে শেষ মুহূর্তে একটা মোক্ষম যুক্তি ছাড়ল, বাড়িতে তার দুই ছেলে একেবারে অবোধ শিশু, তারা দুজনেই অসুস্থ।

"এই দ্যাখো, ওদের জন্যে ওষুধ কিনে নিয়ে যাচ্ছি!"

পকেট থেকে ট্যাবলেট গুলো বের করে দেখাল।

"বলো, এখন কী বলবে? তোমরা হলে গিয়ে ওপরের লোক, একটু ধর্ম-টর্ম তো মানবে নাকি...."

সত্যিকারের ভাবনায় পড়ে গেল যমদূত। ওষুধের অভাবে ছেলে দুটো যদি না বাঁচে, অবশ্য ওষুধ খেলেই যে বেঁচে যাবে, এমন কথা নয়। তবু বাবা-মা'র আশা তো! তারা তো আর জানছে না ওষুধগুলো খাঁটি না ভেজাল।

যমদূত ভাবল, ছেলে দুটোরও কি লাল দাগ পড়ে যাবে দু-একদিনের মধ্যে, ওইটুকু কচিকাঁচা বাচ্চা! এর ওপর স্বামী-পুত্র মারা গেলে নিতাই বকসির স্ত্রীও কী আর বাঁচবে, তিন-তিনটে পাহাড়-প্রমাণ শোক!

কিন্তু একসঙ্গে এত মৃত্যু যদি খাতায় না থাকে, শেষকালে চিত্রগুপ্তই তাকে চোখ রাঙাবে, বলবে, "উল্লু, ঘাড় টানলে মাথা আসে তুই জানিস না!" তখন তাকেই কোথাও অজ জায়গায় ট্রান্সফার করে দেবে।

ভেবেচিন্তে চিত্রগুপ্তকেই টেলিফোন করার সিদ্ধান্ত নিল যমদূত। এত বড় জটিল ব্যাপারে তার মাথা গলানোর দরকার নেই। মাথার ওপরে কর্তাব্যক্তিরা আছেন, তাঁরা যা হুকুম করবেন, সে সেইমতো কাজ করবে!

"হ্যালো!"

তাদের টেলিফোন সিসটেম আলাদা। লাইন পেতে কোনও কষ্ট নেই।

মুখে শুধু একবার হ্যালো বলতেই চিত্রগুপ্ত ফোন তুলে জিজ্ঞেস করল, "কে ?"

"আজ্ঞে, আমি। ছাপ্পান্ন নম্বর যমদূত বলছি।"

"হ্যাঁ, কী হল, নিতাই বকসিকে এখনও আনছ না কেন ?"

"আজ্ঞে, একটু ঝামেলা হয়েছে !"

ঘাড় চুলকোচ্ছে যমদূত।

ঝামেলা! কী ঝামেলা ?"

"আজ্ঞে, নিতাই বকসিকে তুলে নিলে তার মর-মর দুই ছেলে, রুগ্ণা স্ত্রী..." সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল যমদূত।

যমদূত বলল, "হ্যালো, দয়া করে খাতা দেখে একটু বলবেন সপ্তাহখানেকের মধ্যে নিতাই বকসির স্ত্রী-পুত্রের নামে...."

"হ্যাঁ, তা হলে তুইও এ-সপ্তাহটা থেকে যাস, কেমন ? না, ওসব চলবে না! তোদের দেখছি মর্ত্যে গেলে আর আসতে ইচ্ছে করে না।"

কথাটা মিথ্যে নয়। পরলোকে সেই মান্ধাতা আমল থেকে যে কতগুলো জিনিস চলে আসছে, তার কোনও রদবদল নেই! সেই নন্দনকানন, সেই দুধসাগর, সেই নীলকান্তমণি! ইহলোকে এখন কী সুন্দর রংবাহারি টিভি চলছে, কী দারুণ-দারুণ বিজ্ঞাপন! আর তাদের, সেই পুরনো সাদা-কালো, তাতে হয় বক্তৃতা না হলে খবর।

আকাশবাণী, খবর পড়ছি সূর্যদেব। আজকের প্রধান-প্রধান খবর হল, দেবরাজ ইন্দ্র নরকের স্থান বাড়ানোর জন্য তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা মঞ্জুর করেছেন। ....মর্ত্যে দেবভাষার হেনস্থার বিরুদ্ধে মহর্ষি ব্রহ্মা প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বাঘ-ছাগল খেলায় বালক বিভাগের সিঙ্গলসে কার্তিক চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

চিত্রগুপ্ত চালাক, সেও নিজের ঘাড়ে দোষ রাখতে চাইল না। সামান্য একটু গণ্ডগোল হয়ে গেলে সিংহাসন টলমল। আর যমরাজ সিংহাসনচ্যুত হলে তাকে আর নবাবি করতে হবে না।

চিত্রগুপ্ত যমরাজকে ফোন করল। জিজ্ঞেস করল, "ছাপ্পান্ন নম্বর যমদূত মর্ত্যে গিয়ে এই কেস বাধিয়েছে, এখন তা হলে কী করা যায় ?"

যমরাজ বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। লাইনটা হঠাৎ এরকম গোলমাল করছে কেন বলো তো ?"

চিত্রগুপ্ত বলল, "তাহলে মিছিলে-মিছিলে ঠিক ঠোকাঠুকি লেগেছে। আজ ময়দানে কী-কী দুটো পার্টি একইসঙ্গে নাকি মিটিং ডেকেছিল।"

যমরাজ বললেন, "তা হলে একটু দাঁড়াও, মিছিলটা যেতে দাও।"

"কিন্তু মহারাজ, এদিকে আর সময় নেই, মাত্র এক মিনিটের সাড়ে তিনশো ভাগের এক ভাগ...তাও ইণ্ডিয়ান টাইম বলে। আমাদের এক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিতে হবে!"

"তা হলে জোরে জোরে বলো। বলো, খাতায় কী লেখা আছে?"

"আজ্ঞে, খাতায় তো শুধু নিতাই বকসির নামে লাল দাগ।"

"তা হলে বাচ্চা দুটো, কী নাম বললে যেন?"

"আজ্ঞে নটু-পটু!"

যমরাজ বললেন, আচ্ছা অত চিন্তার কী আছে, নটু-পটুদের অসুখ সারিয়ে দাও না!"

"আজ্ঞে, প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম, কিন্তু ওদের ডাক্তার ভুল চিকিচ্ছে করে-করে অসুখটাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে, ওদের ডাক্তারের সেই ভুল ওষুধই এখন খাইয়ে যেতে হবে!"

"আরে না, না, ভুল চিকিৎসায় কখনও অসুখ সারে! তুমি বরং আমাদের ডাঃ অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে এ-ব্যাপারে পরামর্শ করে নাও! দ্যাখো, তিনি কী বলেন?"

"হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?"

"আজ্ঞে, খু-উ-ব অল্প!"

দলে-দলে মারপিট লেগে গেল নাকি? পৃথিবীর এইসব বাজে দাপাদাপি মাঝখানের লেয়ার ভেদ করে অনেক সময় স্বর্গে এসে পেঁছয়। এমনকী, দু-একবার স্বর্গের সব যন্ত্রপাতিগুলোও অচল করে দিয়েছিল।

চিত্রগুপ্ত জোরে চেঁচিয়ে বলল, "কিন্তু অশ্বিনীকুমার তো এখানে নেই, উনি এখন আমেরিকায়।"

"কেন, আমেরিকায় কেন?"

"ওরাই তো এখন বড়-বড় সব ডাক্তার-বিজ্ঞানীদের কিনে নিচ্ছে!"

"সর্বনাশ, তা হলে আমাদের এখানে?"

"না উনি সেখানে একটা সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গেছেন, উনি ফিরে আসবেন।"

"তাই বলো, আমি তো...."

"কিন্তু মহারাজ আর যে মাত্র এক মিনিটের পাঁচশো চুরাশি ভাগের...."

"তা আমি কী করব, আমার তো মাথায় কিছু আসছে না!"

"আজ্ঞে...."

"এই সময়ের মধ্যে নিতাই বকসিকে কি তার বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে ?"

"একেবারেই অসম্ভব ! ট্রেন ছাড়তেই দশ মিনিট লেট হবে মাইকে অনবরত বলছে ।"

"তা হলে লাইনটা দয়া করে ছাপ্পান্ন নম্বর যমদূতকে একবার দাও ! দেখি তার সঙ্গে কথা বলে !"

"যমরাজ বললেন, "হ্যালো ছাপান্ন !"

"হ্যাঁ, বলছি !" ভয়ে কাঁপছে যমদূত। স্বয়ং মহারাজ।

"নিতাই বকসি এখন কোথায় ?"

"আজ্ঞে, ট্রেনের মধ্যে।"

"তা হলে তো ভালই হল, যাও, প্রাণবায়ু টেনে নাও !"

"আজ্ঞে...."

"কী আজ্ঞে-আজ্ঞে করছ, যাও, সময় নেই !"

"কিন্তু মহারাজ, কোন্ দিক দিয়ে টানব, এত ভিড় যে...."

"ভিড় হঠাও, জলদি হঠাও !"

"কিন্তু, আজ্ঞে, হঠাই কেমন করে, একসঙ্গে তাল-পাকানোর মতো সমস্ত লোক, একজনের গায়ে হাত লাগালে বাকিগুলোও সব অক্কা যাবে।"

"কেন গায়ে হাত লাগলে অক্কা যাবে কেন? এক-আধজন হয়তো একটু ছিটকে পড়ে যেতে পারে !"

"আজ্ঞে, ওদের প্রাণপাখি যে শুধু চিঁচিঁ করছে। এ-অঞ্চলে আমাদের সব দিন ডিউটি থাকলে খুব ভাল হয়, এখানকার লোকগুলো মরার আগে থেকে মরে থাকে, ঝরা ফুলের মতো, কুড়িয়ে নিলেই হল।"

যমদূত বলছে, "হুজুর বিশ্বাস করবেন না, এদের প্রাণপাখির ওজন আমাদের টিকটিকির ডিমের চেয়েও ছোট।"

চিত্রগুপ্ত জানাচ্ছে, আর এক মিনিটের এগারোশো ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় অবশিষ্ট আছে। সঙ্গে-সঙ্গে মহারাজ চিৎকার করে উঠলেন, "তা হলে আমাকেই কি শেষ পর্যন্ত যেতে হবে ?"

কিন্তু যমরাজের ইহলোকে যাওয়া যমপুরীর ইতিহাসে আদৌ সুখের ঘটনা নয়।

মনে পড়ে যেতে চিত্রগুপ্ত জানাল সেই পুরনো দিনের সাবিত্রীর গল্পটা, "এখন আরও শিক্ষিত হয়েছে সকলে, আরও চালাক হয়েছে। এখন আপনাকে পেলে শুধু পরমায়ু নয়, গাড়ি-বাড়িও আদায় করে ছাড়বে। নিউ আলিপুরে

ফ্ল্যাট চেয়ে বসলে আপনি মহা ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন !"

যমরাজ শুনে হম্বিতম্বি করে বললেন. "আরে ছাড়ো, ছাড়ো, সে ছিল সত্যযুগের সাবিত্রী, কত নিষ্ঠা ছিল তার। আর এ হল নিতাই বকসি ! লোকটা সারাজীবনে কতগুলো মিথ্যে বলেছে যেন ?"

চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে বলল, "আজ্ঞে সতেরোশো বাহান্ন।"

যমরাজ একটা হুঙ্কার ছাড়লেন। টেলিফোনেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে ত্রিভুবনে থরহরি পড়ে গেল। তিনি টেলিফোন রাখলেন দুদ্দাড় করে, মনে হল যেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছটাই উপড়ে পড়ল কানের কাছে।

গদাটা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেললেন, "হুম !"

যমরাজ দরজা খুলে তালগাছ থেকে কাঁদি নামানোর মতো পা দুটোকে খালি বাতাসে ছেড়ে দিলেন. তরতর করে মর্ত্যে নামতে লাগলেন মহারাজ।

এটাই হল মর্ত্যধামে যমরাজের দ্বিতীয় পদার্পণ।

৩

যমরাজ যমদূতকে নিয়ে আস্তে করে ঢুকে গেলেন ট্রেনের মধ্যে। যমদূত আঙুল বাড়িয়ে চিনিয়ে দিতে তিনি টুঁই করে একটা চাঁটি মারলেন নিতাইদার মাথায়।

নিতাইদা ওতেই কুপোকাত। পড়ে গেল। প্রচণ্ড চেঁচামেচি হচ্ছে। হঠাৎ দেখল একজন কালো জামা-পরা লোক কতকগুলো লোকের পেছনে-পেছনে ছুটছে।

যমরাজ জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, এখানে তোমাদের আরও একজন কেন? একই জায়গায় দুজনের ডিউটি? চিত্রগুপ্তের মাথার কোনও ঠিক নেই দেখছি !"

"আজ্ঞে না, উনি হলেন চেকার। উনি এলেন বলে তো ট্রেনে উঠে নিতাই বকসিকে খুঁজে বের করা গেল।"

"চেকার, সে আবার কী? এখানে আসতে-আসতে 'বেকার' কথাটা খুব শুনছিলাম, তার ভাইটাই নাকি?"

"আজ্ঞে অত খুঁটিনাটি জানি না, তবে দেখি উনি ট্রেনে-ট্রেনে ঘোরেন, আর ওঁকে দেখলেই কিছু লোক দুদ্দাড় করে পড়িমরি পালাতে শুরু করে।"

"ও....আমি ভাবলাম কোনও রকমে হয়তো আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়ে গেছে! যাকগে!

এখন আটটা-দশটা পাখা হাওয়া করছে নিতাইদাকে। মাথায় ডেকচি চাপিয়ে

কেউ জল নিয়ে এল। এবার যত লাগে লাগুক, কত আর মগে-মগে করে আনবে!

রেলের ডাক্তার-অফিসাররা শুনে ছুটে এসেছেন। একজন লোক ট্রেনে ভিড়ের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। অফিসাররা চেকারকে ধমকাতে শুরু করে দিলেন, "নিশ্চয় ট্রেনে উঠেই টিকিট চেক করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। বলিহারি আপনাদের বুদ্ধি! টিকিট ছিল না, তাই ভয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে!"

চেকার বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমি টিকিট চাইনি! আমাকে দেখেই...."

"তা অমন চাঁদ-বদনটা নাই-বা দেখালেন! যান, দুটো লেবু কিনে আনুন!"

"স্টেশনে ট্রেনের মধ্যে ভিড়ের চাপে লোক দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে খবরটা কাগজে বেরোলে রেলমন্ত্রী ছেড়ে কথা বলবেন না। প্রমোশন তো জন্মের মতো গেল, এখন কোথাও ট্রান্সফার না করে দেন।"

এদিকে যমরাজ নিতাইদাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করছেন, "কী নিতাই, কেমন?

নিতাইদা চিঁচিঁ করে বলল, "কী?"

"চড়টা! সামান্য একটু খোঁচা সামলাতে পারলে না!"

"আমার তো আগেই ভিড়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মাথা ঘুরে গেছিল।"

যমদূত বলল, "আমাকে যে নটু-পটুর অসুখের কথা বলেছিলে, মহারাজকে বলো! নইলে উনি ভাববেন আমিই বানিয়ে-বানিয়ে বলেছি!"

নিতাইদা বলল, "দাঁড়াও, ওরা লেবু খাওয়াচ্ছে, খেয়ে নিই!"

যমরাজ চেঁচিয়ে বললেন, "না, আমাদের অত সময় নেই! আর এক মিনিটের তেইশশো ভাগের এক ভাগ...."

লেবুর রস গড়িয়ে পড়ল নিতাইদার ঠোঁট বেয়ে।

রেল কর্মচারীরা সকলে মুখ ঢেকে হায়, হায় করে উঠলেন। মিঃ ভট্টাচার্য ফিসফিস করে মিঃ নন্দর কানে-কানে বললেন, "চাকরি-জীবন ঝরঝরে হয়ে গেল! সাসপেণ্ড করে দেবে না তো!"

নিতাইদা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমার জন্ম তো তেরোশো একচল্লিশের দোসরা অগ্রহায়ণ। তখন রেল-কামরায় পাঁচজনের বেশি লোকই চড়ত না। তা ভিড়ে চেপটে মৃত্যু আমার নামে লেখা হল কী করে?"

যমরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন। চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে বললেন, "না ভিড়ে চেপটে লেখা নেই, তখন চারদিকে বন-বাদাড় ছিল, প্রচুর সাপখোপ ছিল,

তাই লেখা হয়েছিল সর্পাঘাতে মৃত্যু। এখন আমরা সর্পাঘাতগুলোকে ভিড়ে চেপটে করে দিয়েছি।"

যমরাজ বললেন, "ওহে, ও তোমার সর্পাঘাত ছিল।"

সর্পাঘাত শুনে লাফিয়ে উঠল নিতাইদা, "তাই নাকি? তা হলে মহারাজ লখাকে যে সাপটা দিয়েছিলেন, সেটাই আমাকে দিন, কালনাগিনী!"

"সাপ! না, না, এখন সাপটাপ সব তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর...." মহারাজ ফিসফিস করে যমদূতকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই, লখাটা কে?"

আজ্ঞে, লখিন্দর, ওই যে বেহুলা-লখিন্দর, ডাকনাম লখা।"

"ও....! হ্যাঁ শোনো, কালনাগিনীর তো বিষই নেই, ছোকরা তো ভয়ে হার্ট ফেল করেছিল।"

"আজ্ঞে, সে তো তা হলে আরও উত্তম, বিষ নেই মানে বিষের জ্বালাও নেই!" নিতাইদা যেন তা-ধিন তা-ধিন নাচতে লেগে গেল শুয়ে-শুয়ে।

এদিকে যমরাজ বুঝিয়ে যাচ্ছেন, "আরে শুনবে তো কথাটা, তোমার তো মরা নিয়ে কথা, ও সাপে কাটলেও যা, আর ভিড়ে...."

কিন্তু নিতাইদা শুনলে তো, তার এক গোঁ।

রেগে গেলেন যমরাজ, "উঃ, মানুষের দেখছি কামনা-বাসনার শেষ নেই!"

যমদূতকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী করা যায় বলো তো?"

"আজ্ঞে, মনসাকে একবার ফোন করে দেখুন না!"

মনসা লুডো খেলছিলেন। সঙ্গে রিনা-কুন্দা আরও কে একজন। মনসা উপুড় হয়ে বেশ মনোযোগ সহকারে ছক্কার দান ফেলছেন। তাঁর পর-পর দু'বার ছয় পড়তে একজন আপত্তি করল, "না মানব না।"

সেজন্য মনসা এখন একটু আধশোয়া হয়ে দান ফেলছেন। মুখে একসঙ্গে দুটো পান পুরেছেন। মুখের ভেতরটা দোক্তা আর থুতুতে ভর্তি। হাতের কাছে পিক ফেলার সোনার ভাঁড়।

হঠাৎ ফোন বাজতে বিরক্ত হলেন মনসা। এই দুপুরবেলা কার খেয়েদেয়ে কাজ নেই....একজনকে বললেন, "ধর তো, কে কী বলছে শোন!"

সে গলা শুনে চমকে গেল, "এই, মহারাজ, যমরাজ!"

মনসা উঠে এসে ফোন ধরলেন, "হ্যালো!"

"কে, মনসা!"

"হ্যাঁ।"

ছটফট করছেন দান ফেলার জন্য।

"বলুন!"

"একটা কালনাগিনী এক্ষুনি একবার স্টেশনে পাঠাতে হবে।"

"কালনাগিনী! ও এখন কোথায় পাব? হিমালয় ছাড়া গতি নেই।"

"সে তো অনেক দূর, সুন্দরবনে পাবে না? তবু খানিকটা কাছাকাছি হত।"

"সুন্দরবনে যত আজেবাজে সাপের আড্ডা, জলা-কাদা জায়গায় শৌখিন সাপ কি থাকতে চায়!"

"তা হলে?"

"আপনারা কেউ কিছু বলেন না দেখে সাপের কারবার অনেকদিন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি! আপনি চিড়িয়াখানা থেকে নিয়ে নিন না। হ্যাঁ-হ্যাঁ পেয়ে যাবেন! ছাড়ছি তা হলে?"

চেকার পর-পর দুটো লেবুই খাইয়েছেন।

"খান, আর দুটো কোয়া! দু'টাকা জোড়া সিলেটের মিষ্টি লেবু!"

লেবুর রস ভেতরে যেতে ভেতরটা একটু ভাল লাগছে নিতাইদার। ইচ্ছে করলে সে এখন মাথা তুলে দু-চারটে কথা বলতে পারে। কিন্তু মনে-মনে রেলের লোকগুলোকে একটু জব্দ করার জন্য সে প্রায় মরার মতো ঘাপটি মেরে পড়ে রইল।

মহারাজ যমদূতকে বললেন, "ঝাঁ করে একবার চিড়িয়াখানাটা ঘুরে এসো তো! কালনাগিনী থাকলে নিয়ে আসবে, কাজ হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে দেব। আঃ, যাও তাড়াতাড়ি!"

যত সময় যাচ্ছে, মহারাজ তত ঘাবড়ে যাচ্ছেন। চিত্রগুপ্ত এইমাত্র টেলিফোন করে জানিয়েছে, আর এক মিনিটের ছাব্বিশশো ভাগের একভাগ মাত্র...।

যমরাজ রাগে দাঁত কড়মড় করতে-করতে পায়চারি করতে লাগলেন।

চেকার নিতাইদাকে ফের গরম দুধ এনে খাওয়াচ্ছেন। তাঁর একার যত দায়-দায়িত্ব। তোমরাই বলে পাঠিয়েছ ভাল করে চেক করবে, ধর্মপুর পর্যন্ত প্রায় অর্ধেক প্যাসেঞ্জার টিকিট ছাড়াই যাতায়াত করছে। আর তাঁকেই এখন ধমক, "রেলের আয় বাড়ানোর জন্য বাবুর যেন ঘুম হচ্ছিল না! যান, এক পো গরম দুধ নিয়ে আসুন!"

নিতাইদার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, কী খাওয়াচ্ছ, দুধ না ময়দা-গোলা? কিন্তু করল না। যা পাচ্ছি খেয়ে নিই, এরই দাম বাজারে দেড় টাকা।

তবে খুব টুকটুক করে খাচ্ছে নিতাইদা। মাঝে-মাঝে দু'এক ঢোক জিভ দিয়ে

ঠেলে বের করে দিচ্ছে। সবাই তখন ভাবছে, 'আহা লোকটার গলায় দুধটুকুও যাচ্ছে না, কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে, ও কি আর বাঁচবে!'

নিতাইদা হাতগুলোও শিথিল করে ফেলে রাখল। ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডার মাঝে-মাঝে তুলে খাড়া করে দেয়, কিন্তু জলে-গোলা বালির মতো সঙ্গে-সঙ্গে ঢলে পড়ে।

৪

যমদূত চিড়িয়াখানা থেকে খালি হাতে ফিরে এল।

"না নেই।"

"নেই মানে? চিড়িয়াখানায় কালনাগিনী নেই?"

"ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, "কে মশাই রোজ দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষবে! বেহুলা এই সাপটাকে এমন বাজে অভ্যেস ধরিয়ে দিয়ে গেছে!"

যমদূত জিজ্ঞেস করল, "একটা বিরাট ময়াল আছে, তুলে নিয়ে চলে আসব?"

"না! নিয়ে এসে কী হবে, নিতাই বকসির কালনাগিনী চাই!"

মনসাকে ফোন করলেন। রেগে যে ফেটে পড়বেন, তারও সময় নেই, আর মাত্র এক মিনিটের তিন হাজার ভাগের....

"হ্যালো! মনসা!"

"পাঁচ....পাঁচ পড়ু!"

"মনসা শোনো, চিড়িয়াখানায় কোনও কালনাগিনী নেই!"

"মনসা পানের পিক ফেলতে-ফেলতে বললেন, "পাশেই সল্ট লেক, ওখানটায় একবার খোঁজ নিন না!"

যমদূত মহারাজকে জানিয়ে দিল, সল্ট লেকে বাড়িঘর-অফিসে একাকার হয়ে গেছে, সেখানে এক কাঠা জায়গার দাম ভারতীয় মুদ্রায় এখন চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা!

মনসা বললেন, "ঠিক আছে আমি খোঁজ-খবর করে পাঠাচ্ছি, কিন্তু জোগাড় করতে সময় লাগবে।"

যমরাজ বললেন, "আর এক মিনিটের...."

মনসা টেলিফোন রাখতে-রাখতে বললেন, "দেখছি!"

মাথায় হাত দিয়ে বসে-বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। মহারাজ ধপাস করে জনসাধারণের ওই পায়ের ধুলোর ওপরেই রাজপোশাক পরে বসে পড়লেন।

নিতাইদাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেলকর্মীরা তোড়জোড় করছে। শেষ চেষ্টা অক্সিজেন দিয়ে যদি কিছু হয়।

নিতাইদার ভেতরে-ভেতরে খুব ইচ্ছে তার আমের ব্যাগটা ঠিক আছে কি না একবার হাতড়ে দ্যাখে। সে মনে-মনে গুনল ক'টা আম ছিল যেন, ন'টা না দশটা? এখানকার পাবলিককে তার জানা আছে, রোগী দেখার নাম করে দুটো-একটা সট্‌কে দেবে।

যমরাজ ধড়মড়িয়ে উঠে আবার ফোন করতে বসলেন, শুনতে পাচ্ছেন ওদিক থেকে পাঁচ-পাঁচ....ছয়-ছয়, ছক্কা!

"আমি এদিকে চুল ছিঁড়ছি আর তুমি কি না লুডো খেলছ!"

"কেন, পাঠিয়ে দিয়েছি তো!"

"পাঠালে তো পৌঁছচ্ছে না কেন?"

"দেখুন লোকজনের ভিড়ে কোথাও আটকে গেছে! আর-একটা ছয়, ছয়...."

"ধুস্!"

যমরাজ রেগে ফোন ছেড়ে দিলেন। স্বর্গের মেয়েরা দিন দিন কী হচ্ছে! কোনও কালচার বলে জিনিস নেই, বসে-বসে লুডো খেলছে! শুয়ে-বসে ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে, আরে মনোযোগ দিয়ে আসনটাও তো করতে পারিস!"

যমদূতকে ডাকলেন, "এই, এদিকে এসো!"

"আজ্ঞে!"

"কী যে ক্যাবলাকান্তর মতো হাতজোড় করে আজ্ঞে-আজ্ঞে করো! যাও, দ্যাখো তো খুঁজে, মনসা বলছে নাকি কালনাগিনী পাঠিয়েছে!"

"পাঠালেও যে ঢুকবে কোন্‌দিকে....দেখি।"

যাই হোক, যমদূত খুঁজে পেয়ে গেল কালনাগিনীকে, ট্রেনের মধ্যেই ছিল, ফুটো দিয়ে নামছিল।

যমদূত জিজ্ঞেস করল, "কী করব, কালনাগিনীকে নিতাই বকসির আমের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব?"

"তাই দাও! লোকে জানবে আমের গন্ধে ঢুকে পড়েছে!"

"কিন্তু সাপ এল কোত্থেকে, কেউ যদি খোঁজখবর করে?"

"ট্রেনে যা অবস্থা দেখলাম, সেখানে কালনাগিনী কেন, অজগরও যদি তার ছেলেপুলে নিয়ে বসবাস করে তবু কেউ সন্দেহ করবে না!"

৫

রেল-ডাক্তার চিৎকার করছেন, "পেসেন্টকে এক্ষুনি অক্সিজেন দিতে হবে,

না হলে টেকানো যাবে না !”

চেকার হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, “হায়, হায়, কী হবে !”

হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন গার্ড সাহেবও ফুকফুক করে কাঁদছেন। এবং দেখতে-দেখতে যখন দুজনে কাছাকাছি হয়েছেন এবং জড়াজড়ি হয়ে গার্ড সাহেব বলছেন, “ভাই রে....” আর চেকার বলছেন, “দাদা !”

নিতাইদা শুয়ে-শুয়ে রগড় দেখছে। সত্যি মরারও যে এত আনন্দ আছে, সে কখনও ভাবতেও পারেনি।

ট্রেনের ঝাড়ুদার, তারই কামরাগুলো ঝাঁটিয়ে পরিষ্কার করার কথা। “কী ঝাঁট দিয়েছ যে বিষে একটা লোকের শরীর লীন হয়ে আসছে ! নিশ্চয় বিষাক্ত কিছু ছিল তারই কামড়ে....”

“দাঁড়াও, তোমার নামে রিপোর্ট করছি, তুমি ট্রেন ঝাঁট দিলে তো বিষাক্ত জিনিসটা থাকল কী করে ? ভদ্রলোক যদি না বাঁচে তা হলে মনে রেখো তোমার চাকরি এখানেই খতম !”

ঝাড়ুদার তারপর থেকে রেল-ডাক্তারের হাঁটু জড়িয়ে তার স্বরে কেঁদে যাচ্ছে।

কিন্তু সকলে দেখছে ডাক্তার পা নাড়তে পারছেন না বটে, কিন্তু চমৎকার হাত নেড়ে যাচ্ছেন। চেঁচাচ্ছেন, “স্ট্রেচার লে আও, জলদি।”

হঠাৎ দেখা গেল চেকার আর গার্ড সাহেব দু'জনে দৌড়তে-দৌড়তে স্ট্রেচার নিয়ে আসছেন। বহনকারীরা ধর্মঘট করেছে কাল থেকে, এত-এত ভারী-ভারী লাশ দুজনের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাদের ইউনিটে আরও লোক বাড়াতে হবে, আরও কীসব সাত দফা দাবি।

রেল-ডাক্তারই সকলের চেয়ে নার্ভাস, স্টেশনে কারও কিছু হলে আগে তাঁকেই ধরে টানাটানি ! কে কোথায় হাত কাটবে, হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাবে, রাস্তার নোংরা খাবার খেয়ে পেটের গণ্ডগোল বাধাবে সব দেখতে হবে তাঁকে। এখন এ-লোকটি যদি মারা যায়, এর কেস এত জটিল যে, ডাক্তারের সিরিঞ্জে বিষ ছিল কি না ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা হবে, আর সত্যি-সত্যি সেরকম যদি কিছু পাওয়া যায়....ওরে বাবা ! ভাবতেও পারছেন না রেল-ডাক্তার। তা হলে শুধু চাকরি যাওয়া নয়, ফাঁসি হবে ! শহিদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির ফোটোটা তাঁর মনে ছিল, ক্ষুদিরামের জায়গায় নিজের গলাটা বসিয়ে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন রেল-ডাক্তার।

সে-সময়ও হাঁটু জড়িয়ে ছিল ঝাড়ুদার, সেও অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে।

স্টেশনের বড়-অফিসারের স্ত্রী দুপুরে লাউচিংড়ি রেঁধেছিলেন। উপরি

পয়সার পুরোটাই তিনি ভাল-মন্দ খেয়ে উড়িয়ে দেন। ভদ্রলোক একটু ধর্মভীরু। তাঁর বিশ্বাস ও-পয়সা সংসারে লাগালে অচিরে সে-সংসারে লালবাতি জ্বলবে। স্কুটার কিনেছেন, তিনি সব সময় এক লিটারের জায়গায় দু'লিটার তেল পোড়ানোর চেষ্টা করেন। বাড়ির সকলকে বাধ্যতামূলক মিলিটারি ট্রেনিং-এর মতো, বাধ্যতামূলক ভিটামিন ওষুধ খাওয়া বরাদ্দ করে দিয়েছেন। তার ওপর আজ দুধপুলি তো কাল মুরগি-মটন! ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী দেখতে বেশ কুঁদো-কুঁদো হয়েছেন, বড়-অফিসারের দেখলেও ভাল লাগে।

স্টেশনের বেশির ভাগ দায়-দায়িত্ব তাঁর, স্টেশনমাস্টার নামে ছড়ি ঘোরান। ওঁর কাছে রিপোর্ট এলে উনি বলে দেবেন বড় সাহেব আছেন, যা জিজ্ঞেস করার ওঁকেই করুন! ব্যাস খালাস! রোগীকে যে অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, এ আর উঠবে বলে মনে হয় না। বড়-অফিসার তখন থেকে ভাবছেন, তা হলে কী কৈফিয়ত দেওয়া যায়? একটা সন্তোষজনক উত্তর তো দিতে হবে!

তিনি ভাবতে-ভাবতে পায়চারি করছেন। ডান হাতটা চুলে মুঠো করে, বাঁ হাত থুতনিতে। লাউচিংড়ি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, উঠে আসতে বেশ দেরি হয়ে গেছে। এখন ঠেলা সামলাও!

বড়-অফিসার চুল আর থুতনি ছেড়ে নিজে-নিজে কান মুললেন, নাক মুললেন। এবং হঠাৎ আবেগের বসে তিন সত্যি করলেন, "আর কখনও অন্যরকম পয়সা ছোঁব না। এবার থেকে সৎ হব?"

এইসব দেখেশুনে কি না জানি না, নিতাইদা সে সময় মনে-মনে হো-হো করে হেসে উঠল।

কিন্তু একটু পরেই শোনা গেল। চারদিক থেকে হাউ-হাউ কান্নার শব্দ। চেকার আর গার্ড-সাহেব কাঁদছেন স্ট্রেচারের হাতল ধরে, রেল-ডাক্তারের হাঁটু জড়িয়ে কাঁদছে ঝাড়ুদার। রেল-ডাক্তারও ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জন্য যে তুলো এনেছিলেন সেই তুলো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে চোখের জল মুছে যাচ্ছেন। দেখেশুনে বড়-অফিসারও কাঁদতে শুরু করে দিলেন, তিনি অবশ্য সঙ্কোচবশত জোরে কেঁদে উঠতে পারলেন না।

নিতাইদা ঠিক চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিট গতেই মারা গেল।

না, কোর্টে কেস উঠল না। ওরা মিছিমিছি এত ভয় পাচ্ছিলেন।

পুলিশ এনকোয়ারি করতে এল। রেলকর্মীরা নিতাই বকসিকে ছেড়ে এখন দারোগা সাহেবকে ঘিরে ধরেছে।

দারোগা হেসে বললেন, "আপনারা দশজন আছেন, দশখানা বড়

নোট পাব তো ?"

শুনে অনেকক্ষণ পর তাদের সকলের মুখে হাসি ফোটে।

দারোগা ঝাড়ুদারকে বললেন, "যাও, যেখান থেকে পারো একটা সাপ ধরে নিয়ে এসো, জ্যান্ত না হলেও চলবে। কী পারবে তো ?"

"আজ্ঞে...."

"যে-কোনও সাপ, কালনাগিনী বলে চালিয়ে দেব। এখন আর সাপ ক'জন চেনে! যাও, কুইক ?"

দারোগা সাহেব এক হাজার টাকা প্রথমে গুনে নিলেন, তারপর রিপোর্ট লিখলেন, "শ্রীনিতাই বকসি, পিতা স্বর্গত বৃন্দাবন বকসি, নিবাস...."

বড়-অফিসার হাসতে-হাসতে বললেন, "ওটাও স্বর্গত হবে দারোগা সাহেব!"

"কোন্‌টা ?"

"নিতাই বকসি।"

"ইয়েস !"

সঙ্গে-সঙ্গে স্টেশন জুড়ে হাসির রোল পড়ে গেল।

কিন্তু ওদিকে যত সন্ধে হয় নিতাইদা'র স্ত্রী ঘর-বার হতে থাকেন, যত রাত রাত বাড়তে থাকে তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

নুটু-পুটু ছেলে দুটো বেহুঁশ জ্বরে বিছানায় ছটকাচ্ছে।



হাসি কোথায় হারিয়ে গেল! সতাই কোথায় গেল? বিশেষ করে ছোটদের দুষ্টু মুখের মিষ্টি হাসি। সেই দুষ্টুদের কথা মনে রেখেই এই সংকলনটি প্রকাশ করা হল। বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তোমাদের প্রিয় লেখকদের যে সব হাসির গল্প প্রকাশিত হয়েছে তারই থেকে নির্বাচন করে নিয়ে প্রকাশ করা হল ওই হাসির হররা। তোমাদের মনের মতো নানা হাসির গল্প আছে এতে। তাই আমরা জানি, এখন থেকে তোমাদের মুখে মুখে ফিরবে এই বইয়ের মুচমুচে গল্পগুলো

